কয়েদীর পত্র

(গল্প পুস্তক)

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল,
প্রণীত।

বৈশাখ, ১৩২৭

মূল্য পাঁচ সিকা।

উৎসর্গ

পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও চরিত্র গৌরবে

যিনি দেশে বিদেশে সম্পূজিত,

যাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায়, সরল অমায়িক ব্যবহারে

ও মধুর স্বভাব গুণে সকলেই মুগ্ধ,

বঙ্গের সেই সুসন্তান

বাণীচরণাশ্রিত, বিদ্যাবিনয়ালঙ্কৃত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের

চরণ কমলে

এই ক্ষুদ্র উপহার

উৎসৃষ্ট হইল।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক।

নিয়তির গতি (গার্হস্থ্য উপন্যাস)	...	মূল্য	২৲
জীবনের পথে (সামাজিক উপন্যাস)	...	ঐ	১॥০
পৈতৃক সম্পত্তি (গার্হস্থ্য উপন্যাস)	...	ঐ	১॥০
শুকতারা (ছোট গল্প)	...	ঐ	॥০

মজুমদার লাইব্রেরী

কয়েদীর পত্র

কয়েদীর পত্র

পুলিস কর্তৃক যখন ধৃত হই, আমি আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করে নাই। বিচারের সময় সত্য ঘটনা পুনর্ব্বার যথাযথ বর্ণনা করিয়াছিলাম, একটি কথাও বর্জ্জিত করিয়া বলি নাই, কিন্তু তাহার ফলে কি হইল? "আসামীর একটি কথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাহার জবাব সমর্থন করিতে সে কিছুই প্রমাণ দিতে পারে নাই; আসামী সম্পূর্ণ দোষী।" এই বলিয়া বিচারক মহাশয় আমার দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম দিলেন। অথচ আমি স্বচক্ষে জমিদার হরিহর বাবুকে খুন হইতে দেখিয়াছি, এবং বিচারক বা জুরিদিগের মতই এ ব্যাপারে আমি সমান নির্দ্দোষ!

মহাশয়, শুনিয়াছি আপনার উপরই কয়েদীদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক ন্যস্ত হইয়াছে! আপনি তাহাদের হর্ত্তাকর্ত্তা। আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন, আপনি অধীনের এই আবেদন পত্রখানি পড়িয়া হতভাগ্যের প্রতি

কৃপা প্রদর্শন করিয়া গোপনে জমিদার-গৃহিণীর চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন, নিজের সময়ে বা সামর্থ্যে না কুলাইলে বিচক্ষণ গোয়েন্দাও নিযুক্ত করিতে পারেন। তাহা হইলেই আপনি নিশ্চয় জানিতে পারিবেন যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। একবার ভেবে দেখুন, তখন সকলেই শতমুখে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতার এই বলিয়া প্রশংসা করিবে যে, আপনি কৃপাপরবশ হইয়া এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগসহকারে রীতিমত তদন্ত না করিলে, নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর কি এক ভয়ানক অবিচার সংঘটিত হইয়া যাইতেছিল। তাহাই আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার হইবে, কারণ আমি বড়ই দরিদ্র, আপনাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু দিবার আমার সামর্থ্য নাই। কিন্তু আপনি যদি এ আবেদন অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে যেন আর এক রাত্রিও আপনার সুখনিদ্রা না হয়! আপনারই কর্ত্তব্যের অবহেলাবশতঃ একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তি জেলে পচিয়া মরিতেছে, এই চিন্তাই যেন দিনরাত ভূতের মত আপনার ঘাড়ে চাপিয়া থাকে! একটু তদন্ত করিলেই আপনি আসল কথা সব জানিতে পারিবেন। আর একটা কথা স্মরণ রাখিবেন, এই হত্যা-কার্য্যের দ্বারা যদি কেহ উপকৃত হইয়া থাকে, তবে সে জমিদার-গৃহিনী ভিন্ন আর কেহ নহে, কারণ এই ঘটনাই তাহাকে এক অসুখী স্ত্রী হইতে ধনী যুবতী বিধবার অবস্থায় পরিণত করিয়াছে। আপনাকে এই খেই ধরাইয়া দিলাম, আপনি ইহা ধরিয়া অগ্রসর হইলেই ঠিক স্থানে পৌছিতে পারিবেন।

দেখুন, চৌর্য্য অপরাধের বিরুদ্ধে আমি কোনও অভিযোগ করিতেছি না। সে বিষয়ে আমি যথার্থই অপরাধী; এই তিন

বৎসর কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহাই বোধ হয় সে শাস্তির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের কথা, যে অভিযোগে আমার দশ বৎসর কারাশ্রমের আদেশ হইয়াছে—অন্য কোন বিচারক হইলে নিশ্চয় ফাঁসির হুকুম দিতেন,—সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এ কথা জোর করিয়া আপনার নিকট বলিতেছি। এবার ১৩১০ সালের ১৪ই শ্রাবণ রাত্রে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা যথাযথভাবেই আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ইহার যদি একটি বর্ণও মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারেও যেন আমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

আমি জাতিতে সূত্রধর। নিজেদের দেশে জাত ব্যবসা চালাইবার তেমন সুবিধা না হওয়ায় আমি কলিকাতায় চলিয়া আসি। কিন্তু এখানে আসিয়াও জীবিকা উপার্জ্জন করা কঠিন সমস্যা হইয়া দাড়াইল। নিয়মিত আহার না জুটায় আমি অবৈধ উপায়ে উপার্জ্জনের পথ খুঁজিতে লাগিলাম। "চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড় ধরা!" দিনকতক আমিও লোকের চোখে ধূলি দিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিলাম। কিন্তু ধরা না পড়ায় আমার সাহস ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ঘটি-বাটি চুরি করিতে আরম্ভ করিয়া লোকের সিন্দুক-বাক্স অবধি ভাঙ্গিতে বিন্দুমাত্র ভয় পাইতাম না। কোনও রকমে জীবনের দিনগুলো এই ভাবেই কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন বাদামী দীঘিতে বসিয়া আছি, পাশেই দুইজন লোক বসিয়া গল্প করিতেছিল। একজনের বুকপকেটে একটা ঘড়ী ছিল। সেইটার উপরই আমার নজর, সুযোগ পাইলেই উহা

হস্তগত করিবার চেষ্টা। কিন্তু তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। আমি এক বড় শিকারের সন্ধান পাইলাম। একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঐ যে রাস্তার মোড়ে বড় বাড়ীটা, সুমুখে বাগান, ঐ বাড়ীতেই জমিদার হরিহর বাবু থাকেন ?"

"হাঁ, ঐ বাড়ীতেই, খুব বড় বড় থাম। অগাধ ধনসম্পত্তি, কিন্তু লোকটা গোড়া থেকেই বড় কৃপণ।"

"টাকা যদি খরচই না করলুম ত কেবল জমিয়ে লাভ কি ?"

"এই টাকার জোরেই ইনি এক খুব সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেছেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে এঁর প্রথম স্ত্রী মারা যায়। তার পর দশ বছর আর বে-থা কিছু করেন নি। হরিহর বাবুর ছেলে-পিলে কেউ নেই। একবার অসুস্থ হয়ে তিনি বিদেশে হাওয়া পরিবর্ত্তন করতে যান, সেখান থেকে ফিরবার সময় এক পরমাসুন্দরী যুবতীকে সঙ্গে করে আনেন, উনি বলেন, বিদেশেই এই রমণীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু পাড়ার লোকেরা সে কথায় বিশ্বাস না করে নানা গুজব রটিয়ে বেড়ায়। কেউ বলে মেয়েটা নটী, কেউ বলে বাইজি। যা হোক্, ঐ বাড়ীতে যে ঝি ছিল, সে এখন আমাদের বাড়ীতে কাজ করছে। তার মুখেই আমার সব শুনা। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা হলে ব্যাপার যেমন দাঁড়ায়, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। জমিদার বাবু স্ত্রীকে কোথাও যেতে দেন না, দিনরাত নজরবন্দী করে রাখেন। তার উপর লোকটা মহা কৃপণ; শুনি, দেরাজ-সিন্দুক সব মোহর-গিনিতে ভরা, কিন্তু এক পয়সা খরচ করতেও প্রাণটা ফেটে যায়।

মেয়েটার বাপ মা বোধ হয় অর্থের লোভেই তার এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, বিয়ে যদি যথার্থই হয়ে থাকে। কিন্তু সে আশায় তাদের ছাই পড়েছে, মেয়েটার কষ্টের সীমা নেই। স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই ঝগড়া হয়। হরিহর বাবু দিনরাত তাকে তিরস্কার করছেন, মধ্যে মধ্যে দু'এক ঘা প্রহারও করে থাকেন। ঝি ত বলে, মেয়েটারও স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়!"

আমি আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে অপেক্ষা করিলাম না। যাহা সংবাদ পাইয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহের কথা শুনিয়া আমার আর কি লাভ হইবে? সামান্য ঘড়ী চুরির কথা ভুলিয়া গিয়া মনে মনে উচ্চ আশা পোষণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আজ অদৃষ্ট বড়ই সুপ্রসন্ন বলিয়া মনে হইল। আমি একেবারে জমিদার বাবুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাড়ীখানি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিলাম, দেখিলাম এখানে চুরির বিশেষ সুবিধা। আমি সন্ধ্যার সময় চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার ঘরে ফিরিলাম। বিছানায় শুইয়া অনেক ভাবিলাম। প্রথম প্রথম একটু ভয়ও হইল, এত বড় অসমসাহসিক কাজ করিতে গিয়া যদি ধরা পড়ি! তাহার অপেক্ষা এ ত একরকম দিন বেশ চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সুযোগ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। অনাহারে মৃতপ্রায় ব্যক্তির সম্মুখে আহার উপস্থিত, সে কেমন করিয়া তাহার লোভ সম্বরণ করে? তৃষ্ণায় ছাতি কাটিয়া যাইতেছে, সম্মুখে জলপূর্ণ পাত্র পাইলে কোন্ নির্ব্বোধ তাহা স্বেচ্ছায় স্পর্শ করিবে না? আমি ত প্রথম সৎপথে থাকিয়াই জীবিকা-উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, কত লোকের নিকট

কাজের জন্য কত উমেদারী করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই ত এ দীনের করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করে নাই! তবেই ত পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া এ পথ অবলম্বন করিয়াছি। যে ব্যবসায় ধরিয়াছি, তাহাতে উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। আমি তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম, মনস্থ করিলাম, হয় রাতারাতি বড় লোক হইব, নয় জেলে পচিয়া মরিব। দুয়ের একটা,—এ কষ্ট আর সহ্য হয় না! হায়, তখন যদি আমার এ দুর্ম্মতি না ঘটিত!

মধ্য রাত্রে গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়া আমি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। সে সময় পথে লোকজন বড় চলাচল করিতে-ছিল না। আমি সোজা জমিদার বাবুর বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। বাগানের লোহ দরজা ভেজান ছিল, আমি তাহা খুলিয়া নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে সব নিস্তব্ধ। এ রকম ভাবে দরজা খোলা রাখিয়া এমন নিশ্চিন্তভাবে সকলে ঘুমাইতেছে দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। ইহাদের কি চোরের ভয় আদৌ নাই? চন্দ্রের কিরণে স্থানটি আমি বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া লইলাম। বাগানটা পার হইয়া আমি অট্টালিকার সম্মুখীন হইলাম। কোন্ ঘর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে সুবিধা হইবে, অদূরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে শেষ দিকের কোণের ঘরই স্থির করিয়া জানালার দিকে অগ্র-সর হইলাম। জানালার নিকট আসিতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল, ও তাহার শিকল ধরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিল। আমি ভয়ে পিছাইয়া আসিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া

দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে কুকুরটা চুপ করিলে আমি অতি সাবধানে ধীর পদবিক্ষেপে সেই জানালার ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, জানালা ভিতর হইতে বন্ধ। সঙ্গেই ছোরা ছিল। তাহা দিয়া জানালা খুলিয়া ঘরের ভিতর লাফাইয়া পড়িলাম।

"এস, এস, তোমার জন্যেই নীচে নেমে এলুম।"

আকস্মিক বিস্ময়ে জীবনে অনেকবার চমকিয়া উঠিয়াছি, কিন্তু এরূপ অভিভূত কখনও হই নাই। ঘরের ভিতর অদূরেই এক সুন্দরী যুবতী হাতে বাতি লইয়া ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বুঝিলাম, ঘরে ঢুকিতে ইনিই আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যুবতী তন্বী ও ঋজু, তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল মর্ম্মরপ্রস্তরখোদিত বলিয়া মনে হইল। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদুটি জ্বল জ্বল করিতেছে, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম আলুলায়িত, পরিধানে একখানি নীলবর্ণের সাড়ী; মনে হইল যেন আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমার সম্মুখেই স্বর্গের অপ্সরী দাঁড়াইয়া। আমি একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল। অতি কষ্টে জানালায় ভর দিয়া নিজেকে পতনের মুখ হইতে রক্ষা করিলাম। আমার সামর্থ্য থাকিলে আমি তখনই সেখান হইতে পালাইয়া যাইতাম, কিন্তু হায়, আমার দেহের সমস্ত শক্তি কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছিল। আমি সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। যুবতীর কথায় আমার চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, "ভয় কি? তুমি যখন গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলে, আমি শোবার ঘরের জানালা থেকে তোমাকে দেখতে পাই।

আমি চুপি চুপি নীচে নেমে এলুম, তুমি আর একটু অপেক্ষা করলে, আমি নিজেই স্বহস্তে জানালা খুলে দিতুম; আমি ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তুমিও জানালা ভেঙ্গে ভেতরে লাফিয়ে পড়েছ।"

আমার হাতে তখনও সেই উন্মুক্ত ছোরা রহিয়াছে। বাড়ীর গৃহিণীকে চোরের সঙ্গে এরূপ ভাবে কথা কহিতে শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অতি অল্প পুরুষ মানুষই এ অবস্থায় আমার সম্মুখীন হইতে সাহস করিত! কিন্তু এ রমণী এরূপ নির্ভয়ে প্রীতিপূর্ণ নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল, যেন আমি তাহার অতি নিকট আত্মীয়। তিনি হাত ধরিয়া আমাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিলেন।

আমি ছোরাটা তাঁহার চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলাম,—"আপনার কথা ত আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে, এর ফল বড় বিষময় হবে।"

"আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করছি মনে করো না। বন্ধু ভাবেই আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।"

"কিন্তু আমার ত তা বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি কেন আমাকে সাহায্য করতে চান?"

রমণীর চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তবে শুনবে কেন তোমাকে সাহায্য করতে চাই? কারণ আমি তাকে ঘৃণা করি, বড় ঘৃণা করি। এবার কারণ বুঝতে পারলে?"

তখন দীঘিতে সেই অপরিচিত লোকদের কথোপকথন

আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি রমণীর মুখপানে চাহিয়া বুঝিলাম, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি। তিনি স্বামীর উপর প্রতিহিংসা লইতে চাহেন। তাই সংসারে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু যাহা, সেই ধনরত্ন, তাহা হইতে স্বামীকে বঞ্চিত করিয়া পরে তাহার দুরবস্থায় আনন্দপ্রকাশ করিবার জন্যই তিনি চোরকে সাদরে গৃহে আহ্বান করিতেছেন! আমার দ্বারা যদি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়!

জীবনে অনেক লোককে ঘৃণা করিয়াছি, কিন্তু ঘৃণা জিনিষটা যে এত ভয়ঙ্কর হইতে পারে, তাহা এই প্রথম আলোতে জমিদার-গৃহিণীর মুখের ভাবে লক্ষ্য করিলাম।

"তাহ'লে এখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তুমি বুঝতে পেরেছ আমি কে?"

"আপনি যে বাড়ীর গিন্নী, তা আমি আগেই টের পেয়েছিলুম।"

"এ অঞ্চলের সকলেই আমার দুঃখের কাহিনী জানে। কিন্তু তার তাতে ভ্রূক্ষেপই নেই। পৃথিবীতে কেবল একটা জিনিষেরই সে আদর করে, সেই জিনিষটাই তুমি আজ নিতে এসেছ। জানালাগুলো সব বন্ধ করে দাও, বাইরে থেকে কেউ ঘরের ভেতর আলো দেখতে পাবে। চাকর-বাকরেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনও ভয় নেই, আমার সঙ্গে এস। যে সিন্দুকে মহামূল্য অলঙ্কারাদি আছে, তোমাকে দেখিয়ে দেব। তুমি সব ত আর নিয়ে যেতে পারবে না, বেছে বেছে দামী দামী জিনিষগুলো নেবে এখন।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার অনুসরণ করিলাম। আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত,তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। বাড়ীর গৃহিণী স্বয়ং আমাকে বাড়ী লুঠ করিতে সাহায্য করিতেছেন, এ যেন স্বপ্ন বলিয়াই আমার মনে হইতে লাগিল। এই কথা ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে আমার খুব হাসিও পাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিতেই আমি গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলাম। পরে তাঁহার অনুসরণ করিয়া এক ঘরের ভিতর ঢুকিলাম। তিনি এক লোহার সিন্দুকের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"এর ভেতরই সব আছে। কিন্তু চাবি আমার কাছে নেই।"

"তাতে কিছু এসে যাবে না। আমি খুলছি।" এই বলিয়া ছোরা দিয়া তালা কাটিয়া সিন্দুক খুলিয়া ফেলিলাম। তিনি তখন আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, একটু থাম। দেখ, গহনা আর জিনিষ পত্র নিলে পরে ধরা পড়তে পার। তার চেয়ে গিনি মোহর নেওয়াই ভাল।"

"সেই কথাই ভাল। আপনি আমাকে যে এত সাহায্য করছেন, তার জন্যে আপনার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ। চলুন, সেই ঘরেই যাই।"

"এর ঠিক ওপরের ঘরেই সে থাকে। তার বিছানার নীচে এক ক্যাশবাক্স আছে, সেটা গিনি মোহরে ভর্ত্তি।"

"কিন্তু সে বাক্স নিতে গেলে তিনি ত জেগে উঠতে পারেন?"

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"জেগে উঠলেই বা ক্ষতি কি? তার মুখ চেপে ধরে রাখতে পারবে না?"

"না, না, সে সব কিছু করতে পারবো না।"

"তবে যা ভাল বুঝ তাই কর। তোমার চেহারা দেখে মনে হয়েছিল তুমি বড় সাহসী, কিন্তু কাজে দেখছি, তা নও। যদি একটা বুড়ো লোককে দেখে ভয় পাও তাহলে মোহর গিনি তোমার বরাতে নেই! নিজের ভাল যাতে হবে তাই কর। কিন্তু যদি আমার বুদ্ধি শোন, তাহলে মোহর গিনি নেওয়াই নিরাপদ।"

জমিদার-গৃহিণী আমাকে ভীরু বিশেষণে বিভূষিত করিয়া ও অর্থের লোভ দেখাইয়া উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একবার মনে হইল অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে, তাঁহার কথা মতই কাজ করি। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার চক্ষে প্রতিহিংসার একটা জ্বলন্ত ছবি প্রতিফলিত রহিয়াছে দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ ভয় ও সন্দেহের সঞ্চার হইল। তবে কি উঁহার মনে অন্য গুরুতর অভিসন্ধি আছে? আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজের কোন প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন? আমি ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"না উপরে আর যাব না। তাঁকে বিরক্ত করতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না। দু'চার খানা গহনা পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাব।"

রমণী ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু বোধ হয় আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন ভাবিয়া অনেকটা সংযত হইয়া শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন,—"বেশ বেশ, তাই ভাল। দামা দামী দু'চার খানা গয়না বেছে বেছে নাও। সিন্দুকটা খোল দেখি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আমি সিন্দুক খুলিতেই তিনি গহনা বাছিতে লাগিলেন।

এমন সময় অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া চমকিয়া বলিলেন,—"চুপ্, চুপ্, কে আসছে বোধ হয়!" আমি তাড়াতাড়ি সিন্দুকটা বন্ধ করিয়া দিলাম। পদশব্দ ক্রমেই স্পষ্ট ও নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আমাকে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"কর্ত্তা আসছেন! ভয় নেই, এই আলমারিটার পিছনে লুকিয়ে পড়; আমি সব বন্দোবস্ত করে নেব।"

তিনি আমাকে আলমারির পিছনে ঠেলিয়া দিলেন। তার পর হাতে আলো লইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি আলমারির পিছন হইতে তাঁহার গতিবিধি সবই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। দরজার নিকট গিয়া তিনি আগন্তুকের উদ্দেশে বলিলেন,—"কে গা? বাবু নাকি?"

জমিদার বাবু ইতিমধ্যে ঘরের চৌকাটের উপর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার হাতে এক হ্যারিকেন আলো। তিনি স্ত্রীর দিকে সন্দিগ্ধ ও ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"এত রাত্রে তুমি এ ঘরে কেন? কি হচ্ছে এখানে? চোখে ঘুম নেই যে!"

রমণী গভীর অবসাদের সহিত উত্তর করিলেন,—"ঘুম যে পোড়া চোখে আসে না!"

তাঁহাদের দুই জনের কথাবার্ত্তায় ও মুখের ভাব দেখিয়া উভয়ের মধ্যে কতটা প্রীতি ও অনুরাগ বর্ত্তমান, তাহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম।

জমিদার বাবু বিদ্রূপ সহকারে উত্তর করিলেন,—"ঘুম আর হবে কোথা থেকে? যার মনে পাপ আছে,তার চোখে কি ঘুম আসে!"

"তা যদি সত্যি হতো, তাহলে তুমি রোজ রাত্রে অমন নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারতে না।"

রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া জমিদার বাবু চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"জীবনে কেবল একটা অন্যায় কাজই করেছি, তা আর বোধ হয় তোমাকে খুলে বলতে হবে না। তারই শাস্তি আজ আমাকে ভুগতে হচ্ছে!"

"শাস্তি আমাকেও ভুগতে হচ্ছে, সেটাও মনে করে দেখ।"

"তোমার দুঃখ করবার কোন কারণই নেই। তোমার ত অবস্থার উন্নতিই হয়েছে, যত ক্ষতি আমারই ভাগ্যে।"

"আমার ভাল হয়েছে!"

"কুঁড়ে ঘর থেকে এ বাড়ীতে ঢুকতে পেয়েছ, ভাল হয় নি? আমি নির্ব্বোধ, তাই ঘুঁটেকুড়ুনিকে রাজরাণীর আসনে বসিয়েছিলুম।"

"তাই যদি মনে কর, তবে আমায় ত্যাগ কর না কেন? সব গোল চুকে যাবে।"

"পারলে তোমাকে আর বলতে হত না। এ কষ্ট বরং সহ্য হচ্ছে, কিন্তু তখন আর লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারবো না। নিজের দোষে নিজেই শাস্তি ভোগ করছি, সেটাকে আর সকলের নিকট উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করে কৃপা ও উপহাসের পাত্র হতে ইচ্ছা করি না। তা ছাড়াও তোমাকে আমি চোখে চোখে রাখতে চাই। আমি ত্যাগ করলেই তুমি যে তার কাছে ফিরে যাবে সেটি হতে দেব না।"

"মানুষ হলে কি আর আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারতে? তোমার মন পাষাণে গঠিত!"

"হাঁগো, হাঁ, তোমার মনের অভিলাষ আমি সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি বেচে থাকতে, তা পূরণ হবে না, বেশ জেন। ভাবছো, বুড়ো পটল তুল্লেই আমার সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে শিশিরের সঙ্গে খুব স্ফূর্ত্তি চালাবে, তা হবে না, যাদু, আধ পয়সাও তোমাকে দিয়ে যাবো না। যেমন টেনা পরে এসেছিলে, তেমনি ভাবেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে। তুমি এত রাত্রে এখানে কি করছিলে?"

"কি আবার করবো? আমার মাথা আর মুণ্ডু!"

জমিদার বাবু স্ত্রীর প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীও তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার ছোরাটা গহনার সিন্দুকের উপরেই পড়িয়া রহিয়াছে! জমিদার বাবু এখনই ত উহা দেখিতে পাইবেন! আশু ধরা পড়িবার ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল! কিন্তু জমিদার বাবু উহা লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই, গৃহিণী তাহা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর সম্মুখে আসিয়া অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার অলক্ষিতে বাম হস্তে ছোরাটা তুলিয়া লইয়া বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া ফেলিলেন। আমি আরামের সহিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

এবার যাহা বলিব, তাহা সম্পূর্ণ চোখে দেখিয়াছি বলিলে ঠিক বলা হইবে না, উহা এক প্রকার আমার শুনাই। কিন্তু আপনার কাছে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। চোর হইলেও একদিন যে সেই সর্ব্বজ্ঞ পরম বিচারকের

সম্মুখীন হইয়া আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে, তাহা আমি এখনও ভুলি নাই।

জমিদার বাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই লোহার সিন্দুকের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং সিন্দুকের পার্শ্বে হাজির হইয়া উহার অবস্থা দেখিয়াই উনি হিংস্র পশুর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, —"চোর, মিথ্যেবাদী! তবে না কিছু কর নি?" বলিয়া তিনি সজোরে স্ত্রীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং বারংবার সেই শিশিবের নাম উল্লেখ করিয়া স্ত্রীকে দু'চার ঘা প্রহার করিতেও ছাড়িলেন না।

জমিদার-গৃহিণী প্রথম প্রথম উত্তরস্বরূপ গোটাকতক রাগের কথা বলিলেও পরে একেবারে নীরব হইয়া এ অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। মৌনতাই দোষের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ জ্ঞানে জমিদার বাবু তাঁহার ভৎর্সনা ও প্রহারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিলেন। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করিয়া তুলিলেন। জমিদার-গৃহিণী যে নীরবে দাঁড়াইয়া কি প্রকারে এই পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন, আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তখন আমার মনে সন্দেহ হইল, তবে কি উহার স্বভাব-চরিত্র যথার্থই নিন্দনীয়?

জমিদার বাবু হাতে আলো লইয়া অবনতভাবে সিন্দুকের ভিতরকার অলঙ্কারসমূহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; কোনও জিনিষ অপহৃত হইয়াছে কি না, ইহা দেখাই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য। আলোক সিন্দুকের ভিতর ধরিতেই ঘরটা অন্ধকার হইয়া গেল। আমি আমার লুকায়িত স্থান হইতে তাঁহাদের

গতিবিধি আর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, জমিদার বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"গলা ছাড়, মারবি নাকি? আস্পর্দ্ধা কম নয়!" বলিতে না বলিতেই তিনি আবার ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—"শয়তানি, খুন করলি!" আর কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম না। কেবল ঘরের মধ্যে একটা গুরুদ্রব্য পতনের শব্দ আমার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, বেগে বাহির হইয়া আসিলাম। জমিদার বাবুর রক্তাক্ত দেহ মেজের উপর শায়িত দেখিয়া ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, প্রাণবায়ু পূর্ব্বেই নির্গত হইয়া গিয়াছে। মৃতদেহ নাড়াচাড়া করিতে গিয়া আমার কাপড়েও রক্তের দাগ লাগিয়া গেল। পাশ ফিরিয়া দেখিলাম, জমিদার-গৃহিণী সম্মুখেই আলো লইয়া দণ্ডায়মান। আলোর রশ্মি তাঁহার মুখের উপর প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় নিষ্পিষ্ট, গণ্ডস্থল রক্তাভ, চক্ষুদ্বয় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ জ্বলিতেছে! জীবনে এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হইল না।

আমি বিরক্তভাবে বলিলাম,—"তাহলে কাজ শেষ করে ফেলেছেন!"

তিনি ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আর কোনও ভাবনা নেই।"

"এখন কি করবেন মনে করছেন? আপনাকে ত খুনের অপরাধে এখনই ধরপাকড় করবে।"

"আমার জন্যে কিছু ভেব না। আমার জীবনের উপর কোনও মায়া নেই, বাঁচা মরা আমার পক্ষে দুই সমান। তুমি গহনা-পত্র নিয়ে চলে যাও।"

"না, আমার আর ও সবে দরকার নেই। আমি যেতে পারলেই এখন বাঁচি! পূর্ব্বে এমন কাজ কখনও আমি করি নি।"

"নির্ব্বোধ! তুমি চুরি করতেই এসেছ, আর এমন সুবিধে পেয়ে শুধু হাতে চলে যাবে? গহনা নেবে না কেন? কেউ ত আর বাধা দিবে না!"

এই বলিয়া আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি আমার কাপড়ের খুঁটে দামী দামী গহনা সব বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া দিলেন। তাহা লইয়া আমি জানালার দিকে অগ্রসর হইলাম। আর এক তিল সেখানে থাকিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ঘরের বাতাস যেন বিষাক্ত বলিয়া আমার অনুভব হইল। জানালার নিকট আসিয়া একবার পিছনে তাকাইয়া দেখিলাম। তাঁহার সেই দীর্ঘ উন্নত মূর্ত্তির উপর হস্তস্থিত আলোকরশ্মি পড়ায় তাহা বড়ই উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তিনি স্মিতবদনে আমাকে বিদায় দিলেন। আমিও মুহূর্ত্ত মধ্যে জানালা টপ্‌কাইয়া বাহিরে বাগানে লাফাইয়া পড়িলাম।

আমার দ্বারা যে এ বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইল না, ইহা ভাবিয়া আমি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু তখন যদি জমিদার-গৃহিণীর মনের ভাব বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে ব্যাপার নিশ্চয়ই অন্যরূপ দাঁড়াইত। তাঁহার বিদায়কালীন হাসির নিগূঢ় অর্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে একটা

মৃতদেহের পরিবর্ত্তে দু'টা মৃতদেহ ঘরের মেজের উপর শায়িত থাকিত। কিন্তু তখন পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চিন্তাই আমার মনে উদিত হয় নাই। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, শয়তানী ইচ্ছা করিলে আমার গলাতেই ফাঁসি পরাইতে পারে! জানালা হইতে লাফাইয়া বাগানে দু'পা অগ্রসর হইতে না হইতেই ভীষণ চীৎকারে সমস্ত স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল। ঘন ঘন চীৎকার-ধ্বনি নৈশ সমীরণে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

জমিদার-গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"খুন, খুন! কে কোথায় আছ, বেরিয়ে পড।" রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সে স্বর বাড়ীর সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে চীৎকারে নিস্তব্ধ পল্লীটাও যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ভয়ঙ্কর চীৎকার আমার বিকৃত মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা-জানালা খোলার শব্দ শুনিতে পাইলাম, চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। আমি কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া বাগানের ভিতর একটা অন্ধকারময় স্থানে লুকাইয়া পড়িলাম। কিন্তু তাহা নিরাপদ নহে ভাবিয়া, সেইখানেই গহনাগুলা ফেলিয়া ফটকের দিকে দৌড়িলাম, কিন্তু তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই লোকজনেরা ফটক বন্ধ করিয়া দিল। আমি পুনর্ব্বার বাগানের ভিতর চলিয়া আসিলাম এবং প্রাচীর ডিঙ্গাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময় কুকুরটা ছাড়া পাইয়া আমার পা কামড়াইয়া ধরিল। বাড়ীর দরোয়ান আসিয়া কুকুরটাকে না ধরিলে, সে টুকরা টুকরা করিয়া আমাকে মারিয়াই ফেলিত। পরে সকলে মিলিয়া আমাকে বন্দী করিয়া সেই ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে গিয়া দরোয়ান আমাকে দেখাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, এই লোকটাই কি ?"

গৃহিণী তখন মৃত স্বামীর দেহের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতে-ছিলেন। দরোয়ানের কথা শুনিয়া রাগান্বিতভাবে আমার দিকে তাকাইলেন। হায়, শয়তানী কত ছলই জানে!

তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, এই লোকটাই।" পরে আমার উদ্দেশে বলিলেন, "পিশাচ! বুড়ো লোককে এই রকম ভাবেই খুন করতে হয়!"

এমন সময় পুলিশ আসিয়া আমাকে ধরিল। আমি উন্মাদের ন্যায় চেঁচাইয়া উঠিলাম,—"উনি নিজে এই কাজ করেছেন, আমি কিছুই জানি না।"

"যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা" বলিয়া দরোয়ানটা আমার গালে দুই চাপড় বসাইয়া দিল। তথাপি আমি সজোরে বলিতে লাগিলাম,—"উনিই ছোরা দিয়ে নিজের স্বামীকে খুন করেছেন। আমি স্বচক্ষে এ ব্যাপার দেখেছি। উনি প্রথম আমাকে চুরি করতে সাহায্য করেন, পরে জমিদার বাবু নেমে আসতে তাঁকে খুন করেন।" এই বলিয়া আমি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। কিন্তু তিনি নিরপরাধিনীর ন্যায় অবিচলিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

দরোয়ানটা পুনর্ব্বার আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। গৃহিণী তখন কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে বলিলেন,—"না, আর মেরে কাজ নেই। বিচারে যা শাস্তি হয় ভোগ করুক্।"

পুলিশের লোক উত্তর করিল,—"মাজি আমি তাহলে একে

বেঁধে থানায় নিয়ে যাই? আপনি স্বচক্ষে একে খুন করতে দেখেছেন ত?"

"নিশ্চয়ই, স্বচক্ষে দেখেছি। সে দৃশ্য মনে পড়লে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! নীচে শব্দ শুনে আমরা নেমে আসি। এই লোকটা তখন সিন্দুক খুলে গয়না চুরি করছিলো। কর্ত্তা এসে বাধা দিতেই দু'জনে ঝটাপটি লেগে গেল। বুড়ো লোক, ওর সঙ্গে পারবে কেন? লোকটা কাপড়ের ভেতর থেকে ছোরা বার করে কর্ত্তার পিঠে বসিয়ে দিলে। ঐ দেখ, এখনও ওর হাতে রক্তের দাগ রয়েছে, আর ছোরাটা কর্ত্তার পিঠে বসান রয়েছে।"

আমি উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বলিলাম,—"ঐ দেখ, ওঁর হাতেও রক্তের দাগ রয়েছে!"

দরোয়ানটা বলিয়া উঠিল,—"তা আর হবে না, কর্ত্তাবাবুকে ধরে বসে রয়েছেন, রক্ত হাতে লাগবে না?"

সত্য কথা বলিতেছি, আমি আর কোনও উত্তর করিতে পারিলাম না। নির্ব্বাক হইয়া গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি যেন আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া আমার উদ্দেশে বলিলেন,—"আমার ত সর্ব্বনাশ করেছ, তোমাকে জেলে দিয়ে আমার সে ক্ষতির এক বিন্দুও পূরণ হবে না। অনু-তাপই তোমার পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু পুলিসে ছাড়বে কেন?" ইনি যে রঙ্গালয়ে অভি-নয় করিলে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আমাকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সকলেই স্থির করিল, আমার দ্বারাই নিশ্চয়

এই পাপ কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, নতুবা গৃহিণীর কথা শুনিয়া আমি এইরূপ মৌনভাব অবলম্বন করিব কেন? তখন পুলিসের লোকে আমার হাতে হাতকড়ি বাঁধিয়া আমাকে থানায় লইয়া গেল।

মহাশয়, নিজের স্ত্রী কর্ত্তৃক জমিদার বাবুর হত্যা কথা যথাযথ ভাবেই আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম। পুলিসের লোকে বা বিচারপতি ইহা যেরূপ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল, আপনিও কি তাহাদেরই পন্থা অনুসরণ করিবেন? যদি ইহার মধ্যে এক তিলও সত্য নিহত আছে বলিয়া আপনার ধারণা হয়, তাহা হইলে ইহার তদন্ত করুন। যাহারা ন্যায় ও সত্য রক্ষার জন্য নিজেদের স্বার্থ অকাতরে বলি দিয়া পৃথিবীতে স্বনামধন্য হইয়া গিয়াছেন, আপনার নামও তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিবে। মহাশয়, আপনি ভিন্ন আর কাহার নিকট দুঃখের আবেদন জানাইব? আপনি যদি এই মিথ্যা অভিযোগ হইতে আমাকে মুক্ত করিতে পারেন, আমি আপনাকে আজীবন এরূপ ভক্তি ও পূজা করিব যে, মানুষ মানুষকে পূর্ব্বে কখনও ততটা করিতে পারে নাই। কিন্তু এ দীনের প্রার্থনা যদি আপনিও হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তাহা হইলে নিশ্চিত জানিবেন যে, আজ হইতে এক মাস পরে আমি যে প্রকারে পারি আত্মহত্যা করিব, এবং সম্ভবপর হইলে তদবধি প্রতি রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে আপনাকে দেখা দিয়া আপনার জীবনের সুখ-শান্তি চিরতরে ভঙ্গ করিয়া দিব। আমার প্রার্থনা অতি সহজেই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। জমিদার-গৃহিণীর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করুন, তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করুন, তাঁহার অতীত জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করুন, স্বামীর অগাধ

ধন-সম্পত্তির তিনি এখন কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাহার সন্ধান লউন, এবং আরও সন্ধান লউন, আমি যাহা বলিয়াছি, শিশির নামে তাঁহার কোনও প্রণয়াস্পদ আছে কি না। এই সব হইতে যদি তাঁহার প্রকৃত চরিত্র আপনি অবগত হন, আমি যাহা বলিলাম, তাহা যদি সত্য বলিয়া আপনার স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে আপনি যে হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখাইয়া এই নির্দ্দোষ ব্যক্তির উদ্ধারকল্পে চেষ্টা করিবেন, তাহা কি আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস কবিতে পারি না?

রামচরণ

"নবপত্র" নামে এক নূতন মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া বিদেশে তাহার গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য সঙ্গে একটি চাকর ও কতকগুলি পত্রিকা লইয়া কলিকাতা হইতে ঢাকা সহরে গিয়া হাজির হই। সেখানে বাজারের নিকট একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া নিজের কাজ চালাইতে লাগিলাম। আমাদের ঘরের সম্মুখেই এক মুড়ি-মুড়কির দোকান ছিল; সেই দোকানটি এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের। তাহার তরুণবয়স্ক ভাইপো রামচরণই সেই দোকানের তত্ত্বাবধান করিত। মধ্যে মধ্যে দেখিতাম বৃদ্ধা সঙ্গে একটি দশ বার বছরের মেয়ে লইয়া বিক্রয়ের জন্য দোকানে জিনিষ-পত্র দিয়া যাইত। রামচরণের হাতে যখন কোনও কাজ থাকিত না, তখন সে প্রায়ই আমার ঘরে আসিয়া মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া এক মনে ছবি দেখিত ও আমাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। রামচরণ নিম্নশ্রেণীর লোক হইলেও, তাহার কথাবার্ত্তায় ও আচার-ব্যবহারে এমন একটা নম্রতা ও শিষ্টতা মিশ্রিত ছিল যে, তাহার সঙ্গে দু'দিন কথা কহিয়াই আমি তাহার গুণে বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। রামচরণ যতই দিন যায়, আমার প্রতি ততই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। নিজে নিরক্ষর, আমি পুস্তক লিখি ও পুস্তকের ব্যবসা করি দেখিয়াই বোধ হয় আমার প্রতি তাহার ভক্তির মাত্রা দিন দিন বাড়িতে

লাগিল। আমাকে গুরুর আসনে বসাইয়া অন্ধ ভক্তের ন্যায় সে আমার পূজা করিতে লাগিল। আমার চাকর কার্য্যান্তরে গেলে সে স্বেচ্ছায় আমার কাজ করিয়া দিত, এবং আমার কোন একটু কাজে লাগিতে পারিলেই নিজেকে যেন ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিত।

একদিন দুপুর বেলা আমার চাকরটাকে কোন জরুরি কাজে স্থানান্তরে যাইতে বলি; সে হঠাৎ উত্তর করিল,—"বাবু এখন যেতে পারবো না, বিকালে যাবো।" উত্তর শুনিয়াই আমার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল! আমি সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রাপ্য মাহিনা চুকাইয়া দিয়া তাহাকে কাজে জবাব দিলাম। পরদিন দেখি রামচরণ সেই চাকরটাকে পুনর্ব্বার কাজে বাহাল করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছে। আমি কিছুতেই তাহার কথায় সম্মত হইলাম না। পরন্তু তাহাকে বলিলাম,—"রামচরণ, তুই আমার কাছে থাকবি, ওকে আর আমি রাখবো না।"

আমার কথা শুনিয়া রামচরণ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সে স্মিতবদনে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি যখন যেখানে যাব, আমার সঙ্গে যেতে পারবি?" "আজ্ঞে হাঁ, খুব যাবো। দিল্লী যেতে বল্লেও আমি রাজি আছি।" এই কথার দ্বারা রামচরণ যে দিল্লী অপেক্ষা বেশী দূর স্থানে যাইতে স্বীকৃত হইবে না, এইরূপ জানাইল, তাহা নহে; তবে দিল্লী সহরটাই যে ভারতের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত, ইহাই নিরক্ষর লোকদের দৃঢ় ধারণা! আমি তখন তাহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, রামচরণ, তোর পিসী তোকে ছেড়ে দিতে রাজি হবে?"

"আজ্ঞে হাঁ, তার জন্যে আপনার কোনও ভাবন নেই, সে বন্দোবস্ত আমি করে নেব।"

পরদিন হইতেই রামচরণ আমার নিকট কাজ করিতে আসিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যতটা আশা-ভরসা লইয়া ঢাকাতে গিয়াছিলাম, দিন দিন তাহা নির্ম্মূল হইয়া আসিতে লাগিল। বড় উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, দীনা বঙ্গভাষার শ্রীহীন অবস্থার উন্নতি সাধন কল্পে, রক্ষণশীল বঙ্গবাসীকে নব-বাণী শুনাইয়া তাহাদের চৈতন্য উদ্‌বুদ্ধ করিবার মানসে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া এই দুর্দ্দিনে কাগজের মহার্ঘতা সত্ত্বেও "নবপত্র" বাহির করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ইহার দস্তরমত বিজ্ঞাপন দিতে পারিলে, পত্রিকার বহুল প্রচা-রের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও কল্যাণ সাধিত হইবে, নিজেরও বেশ দু'পয়সা লাভ হইবে। পরের দাসত্ব করিয়া আর এই মহা-মূল্য জীবনটা নষ্ট করিতে হইবে না। কিন্তু হায়, অবোধ বাঙ্গালী তাহা বুঝিল না!

প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় খুব জোর করিয়া আমাদের ভাষার ও সমাজের পুরাতন কুরীতি ও কুসংস্কারগুলিকে প্রবলভাবে আঘাত করিয়া প্রবন্ধ বাহির করিলাম। 'পৌরাণিক চরিত্র' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, ও সব চরিত্র সম্পূর্ণ মিথ্যা, কবি-কল্পনা মাত্র, গাঁজাখোরের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। ইহা পড়িয়াই আমাদের দলের একজন প্রধান পাণ্ডা আমাকে উৎসাহিত করিয়া এক লম্বা পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন; বড় আশা ছিল তৃতীয় সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই সেই পত্রখানি ছাপাইয়া দিব, কিন্তু হায়, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ

তৃতীয় সংখ্যা আর পৃথিবীর আলো দেখিতে পাইল না। কে তখন ভাবিয়াছিল এতকাল ধরিয়া মাথার ভিতর যে সব ভাবের বেগ বহুকষ্টে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ সম্মুখে প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইয়াও দু'দিনেই তাহার প্রবাহ থামিয়া যাইবে? এত শীঘ্র আকাশকুসুম শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িবে?

দু'চার জন বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কলিকাতায় আর কাহাকেও গ্রাহক জুটাইতে পারি নাই। অনেকেই মুখে আমার সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করিলেই তাহারা নানা ওজর-আপত্তি তুলিত। কলিকাতায় সুবিধা না হওয়ায় ঢাকায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। এ দেশের লোক এখন নবভাবে জাগ্রত, নববাণী শুনিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল, তাই ভাবিয়াছিলাম আমার এ বাঁশীর সুর তাহাদের কর্ণে মিঠা বাজিতে পারে। কিন্তু সেখানেও নিরাশ হইতে হইল। পরে পূর্ব্ববঙ্গের আরও নানাস্থানে ঘুরিলাম, লোককে নানা রকম করিয়া বলিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোথাও গ্রাহক মিলিল না, শেষে হতাশ হইয়া আবার কলিকাতাতেই ফিরিয়া আসলাম, রামচরণও আমার সহিত আসিল। এতদিন ছায়ার ন্যায় সে আমার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং বিশেষ দুঃখের সহিতই প্রতি পদে আমার এই নিষ্ফলতা ও নৈরাশ্য লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। আমার এক আত্মীয় কলিকাতায় বাসা ভাড়া লইয়াছিলেন; আমিও সেই বাড়ীতেই একখানি ঘরে থাকিতাম। আসিয়া দেখিলাম, তাঁহারা বাসা উঠাইয়া দিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। কি করি, এক মেসে উঠিয়া একখানি ঘর ভাড়া লইলাম। পরদিন রামচরণকে ডাকিয়া

বলিলাম,—"রামচরণ, আমার ত এই অবস্থা দেখতে পাচ্ছিস্। টাকাকড়ি হাতে যা কিছু ছিল, প্রায় সব খরচ হয়ে গেছে। কাগজও ত চলে না, উঠে যাবার যোগাড়! এখন যে আর আমি তোকে মাইনে দিয়ে রাখতে পারবো, বিশ্বাস হয় না। চল তোকে আমার এক বন্ধুর বাড়ী রেখে আসি।" সে কিছুতেই রাজি হইল না, বলিল,—"বাবু, আমাকে এখন আর মাইনে দিতে হবে না। মাইনে যা পাওনা আছে, তাও আপনার সুবিধা মত দিলেই হবে। আমাকে খালি দুটি খেতে দেবেন, আর আমি কোথাও যেতে পারবো না।" এ লোককে কি প্রকারে বলি, তোমাকে ভাত দিবার মতও অবস্থা আমার নহে? কিন্তু ক্রমেই আমার অবস্থা যখন বড়ই মলিন হইয়া উঠিতে লাগিল, রামচরণ নিজেই বুঝিল, বাবু আর মুখে কিছু না বলিতে পারিলেও, তাহাকে খাওয়াইতেও আমার কষ্ট হইতেছে। সে একদিন আমাকে বলিল,—"বাবু আমাকে একটা টাকা দেবেন?" ভাবিলাম হয় ত এবার দেশে যাইবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়াছে। আমি উত্তর করিলাম,—"তা দেব। তুই বাড়ী যাবি ত?"

"আজ্ঞে না, আমি বিড়ির দোকান খুলবো। আমি বেশ বিড়ি তৈয়ারী করতে জানি, মসলা কিনে বিড়ি তৈরী করবো।"

আমি তাহাকে একটি টাকা দিলাম। সে পরদিন হইতে বিড়ি তৈয়রী করিয়া নিজের খাবার খরচের পয়সা রোজগার করিতে লাগিল এবং সেই দিন হইতে তাহার খরচ সে নিজেই মেসে দিতে লাগিল। সকাল বেলা আমার কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া সে নিজের কাজে যাইত; আবার সন্ধ্যাবেলা কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইত। আমি

তাহাকে অত পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিতাম, কিন্তু সে কিছুতেই আমার মানা শুনিত না। রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া সে আমারই ঘরের এক কোণে শুইত। যতক্ষণ না আমি ঘুমাইতাম, আমার সেবা করা, আমার সঙ্গে গল্পগুজব করা, আমার হতাশ প্রাণে উৎসাহ প্রদান করা, ইহা তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে গণ্য ছিল। আমি কাগজের উন্নতির আশা-ভরসা ত্যাগ করিয়া চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু এ বাজারে যাহাদের চাকুরী ছিল, তাহাদেরই চাকুরী যাইতেছে, নূতন চাকুরী কোথায় মিলিবে? তখন যথার্থই নিজের উপর ধিক্কার জন্মিল। আপনার লোকেদের মতের ঘোর বিরুদ্ধে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া, বহুকষ্টে সঞ্চিত অর্থ ভাঙ্গিয়া এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ভূত কেন আমার ঘাড়ে চাপিয়াছিল? আমি কি তখন এতই নির্ব্বোধ বনিয়া গিয়াছিলাম? এখন যথার্থই বুঝিতে পারিলাম, এ সব খেয়াল চরিতার্থ করা ধনী লোকেরই শোভা পায়!

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও মানসিক দুশ্চিন্তায় হঠাৎ রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলাম। দিনরাত পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। এমন কোন আত্মীয়-বন্ধু নিকটে নাই যে, এক মিনিটও পাশে বসিয়া যন্ত্রণার একটু উপশম করিয়া দেয়। বাড়ীর সকলেই আমার ব্যবহারে আমার উপরে একেবারে হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। তাহাদের আর এ সময় খবর দিয়া বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিলাম না। ভাবিলাম অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। কিন্তু রামচরণ আত্মীয়ের অভাব আমাকে কিছুতেই বুঝিতে দিল না।

সেই আমার অভিভাবক সাজিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতেছে, ডাক্তারকে নিয়মত রোগীর সংবাদ দিয়া আসিতেছে, নিজের কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া পরমাত্মীয়ের ন্যায় আমার সেবা করিতেছে, আবার কখনও বন্ধুবান্ধবের ন্যায় আমাকে কত উৎসাহ দিয়া যন্ত্রণার লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেছে। রামচরণ যে পূর্ব্বজন্মে আমার কে ছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। একি, এ যেন শীতলামূর্ত্তিতে আমার এই অসহ্য যন্ত্রণায় শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া যন্ত্রণার উপশম করিতেছে, অভয়দায়িনী মূর্ত্তিতে আমার দুর্ব্বল অন্তঃকরণে সাহস দিতেছে,—ভয় নাই, আবার দুর্গতিনাশিনী মূর্ত্তিতে দুর্গমে আমাকে রক্ষা করিতেছে। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই আমি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলাম। তখন রামচরণের স্ফূর্ত্তি আর ধরে না। দু'একদিন পরে দেশ হইতে তাহার এক পত্র আসিল, পিসীমার বড় অসুখ, তাহাকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছে। পূর্ব্বে দু'একখানা পত্রে তাহার পিসীমা তাহাকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছিল কিন্তু সে যাইতে স্বীকৃত হয় নাই। আমিও এ বিষয়ে দু'একবার তাহাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশী পীড়াপীড়ি করিতে পারি নাই, পাছে সে মনে করে বাবু আমাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। এবার আমি তাহাকে ধরিয়া বসিলাম,—"রামচরণ, এখন আমি বেশ ভাল আছি, তুমি এবার দিন কতকের জন্যে বাড়ী যাও; পিসীমার অসুখ, না গেলে দোষ হবে। আচ্ছা, বাড়ী যেতে চাও না কেন বল ত, পিসীমার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছ নাকি?"

সে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে আমার দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—"বাবু, সে অনেক কথা!"

আমি সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে তাহাকে বলিলাম,—"থাক্, যদি কষ্ট হয় ত বলে কাজ নেই।"

"না, বাবু, আপনাকে সব খুলে বলছি শুনুন; শুনে বিচার করবেন দোষ কার—আমার না পিসীমার? বাবু, আমি বড়ই হতভাগা, আমার বয়স যখন সাত বছর, তখন আমি পিতৃমাতৃহীন হই। সেই থেকেই আমার বিধবা পিসী আমাকে তাঁর বাড়ীতে এনে মানুষ করে আসছেন। বাপ-মার অভাব পিসীমা আমাকে কিছুই জানতে দেন নি। পিসীমার ছেলে পিলে কেউ ছিল না। তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করতে লাগলেন; আমি যখন যা আবদার ধরেছি পিসীমা তাই পূরণ করেছেন। তাঁর ঐ মুড়ি-মুড়কির দোকানে আমি বসে থাকতুম ও জিনিষ-পত্র বেচতুম। বছর খানেক পরে পিসীমা আমাকে নিয়ে আমাদেরই স্বজাতি এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে যান। সেখানে সেই স্ত্রীলোকটি হঠাৎ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ে। তার একটি মাত্র চার বছরের ছোট মেয়ে ছিল। মারা যাবার আগে সে পিসীমার হাতেই তার ছোট মেয়েটিকে সঁপে দিয়ে যায়। পিসীমা যথারীতি তার সৎকারাদি করিয়ে আমাদের নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। মেয়েটির নাম হচ্ছে জগা, পুরোনাম জগদম্বা। জগা সেই থেকেই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, আমাকে দাদা বলে ডাকে। তারও বাপ মা নেই বলে আমি তাকে বড় ভালবাসতুম ও আদর যত্ন করতুম। পিসীমাও আমাদের দুজনকে সমান স্নেহ করতেন ও মাঝে মাঝে বলতেন,—'বড় হলে তোদের দুজনের বিয়ে দিয়ে দেব।' তখন ছেলেমানুষ কিছু বুঝতে পারতুম না, হেসেই কথাটা উড়িয়ে দিতুম। ক্রমেই যত বয়স বাড়তে লাগলো, জগার

উপর আমার ভালবাসা দিন দিন বাড়তে লাগলো। কোনও ভাই বোধ হয় নিজের বোনকেও আমার চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারে না। জগা কিসে সুখী হবে, সেদিকে আমার সর্ব্বদাই নজর ছিল। তার জন্য হাট থেকে পুতুল খেলনা কিনে আনতুম; সেও ছোট বোনটির মত আমাব প্রতি বড় রত ছিল। আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধানের জন্য সে প্রাণপণ যত্ন করতো। আমাদের এ মিল দেখে পিসীমা বড়ই আনন্দিত হতেন।

"পরে বাবু দেখতে দেখতে আট বছর কেটে গেল। আমার বয়স তখন ষোল বছর, জগা বার বছরে পড়েছে। আপনি আমাদের দেশে যাবার কিছুদিন আগে, পিসীমা একদিন রাত্রে আমাকে ধরে বসলেন এই মাসের মধ্যেই ভাল দিন দেখে তোর সঙ্গে জগার বিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো। আমি ত শুনেই বেঁকে বসলুম, না ওকে আমি কিছুতেই বে করতে পারবো না। পিসীমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। এই আট বছর ধরে যে আশা তিনি মনে মনে পুষে এসেছেন, আমাদের দুজনের মধ্যে এত মনের মিল ও ভাব দেখে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি, আমি তাঁর সে আশা এমন করে এক কথায় নির্ম্মূল করে দেব। তাঁর বড় রাগ হলো, এ ত বাগ হবার কথাই! তিনি বল্লেন, 'অমন সুন্দর মেয়ে, কত গতর, তোকে কত ভালবাসে, তুইও এত ভালবাসিস্, কেন বে করবি নি বল।' আমি কি উত্তর দেব ঠিক করতে পারলুম না, মনের মধ্যে অনেক কথা উঠতে লাগলো, কিন্তু মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করতে পারলুম না; আমি কেবল বল্লুম,—'বোনকে কেউ আবার বে করে?' পিসীমা উত্তর শুনেই হেসে উঠলেন,—'বোন আবার কিরে? দুজনে একসঙ্গে থাকলেই কি ভাই বোন হয়ে যায়!

ছেলেমানুষি কথা ! ওসব পাগলামি ছেড়ে দে, যা বলি, তা শোন।' আমি কিন্তু কিছুতেই রাজি হলুম না ; জগাও আমার পাশে বসে ছিল। সে হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"যে দিন আপনার সঙ্গে কাজের ঠিক করি, সেদিন সকালে ঐ নিয়ে পিসীমার সঙ্গে খুব তর্কাতর্কি হয়। পিসীমা রেগে বলে উঠলেন, 'আমার এখানে থাকতে গেলে অবাধ্য হলে চলবে না।' তিনি ভেবেছিলেন ভাল কথায় হলো না, বোধ হয় ভয় দেখালে আমি রাজি হবো ! কিন্তু কাজে তা হলো না, আমি আপনার কাছে কাজে লেগে গেলুম। পিসীমা আমার উপর খুব রেগে ছিলেন, কথা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। আপনি তখন ঢাকা ছেড়ে অন্য যায়গায় গেলেন। আমিও প্রতিজ্ঞা করলুম যতদিন না জগার অন্য কারও সঙ্গে বে হয়, আমি বাড়ী ফিরবো না। আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগলুম। প্রথম কলকাতায় এসে পিসীমার জন্যে প্রাণটা বড় কাতর হয়। যে মার মত আদর-যত্ন করে আমাকে লালন-পালন করেছে, তার কথার অবাধ্য হয়ে তার মনে কষ্ট দেওয়া আমার সাধ না ইচ্ছা ? কিন্তু কি করি, আপনিই বলুন না, যাকে আট বছর ধরে নিজের ছোট বোনের মত দেখে এসেছি, ভালবেসে এসেছি, তাকে কি করে বে করি ? হাঁ, এখন পিসীমার মনও নিশ্চয়ই আমার জন্যে খুব কাঁদছে। তিনি বাড়ী ফিরবার জন্যে দু তিন খানি পত্র দেন ; আপনি ত তারপর সবই জানেন। আমার বাড়ী না যাবার এই একমাত্র কারণ। আপনি ত সব শুনলেন, এখন আপনিই বিচার করুন, দোষ কার ?"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার কথা শুনিতেছিলাম। আমার আপদে বিপদে সে যেরূপ ছায়ার ন্যায় নিঃস্বার্থ ভাবে আমার

অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, কঠিন রোগে সে যে উপায়ে আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে, অবশ্য তজ্জন্য পূর্ব্বেই আমার মনে তাহার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। বৃথা এত অর্থ নষ্ট করিয়া মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলাম বলিয়া পূর্ব্বে যে মনে একটা আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত, অনুতাপানলে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইত, এখন রামচরণের নিষ্কাম সেবা ও পরোপ-কারিতা দেখিয়া সে ভাব আমার মন হইতে একেবারে দূর হইয়া গিয়াছিল। হায়! লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও রামচরণের ন্যায় লোকের মন জয় করিতে পারা যায় না, আমি যে সামান্য টাকা খরচের বিনিময়েই তাহাকে পাইয়াছি! কি শুভক্ষণেই মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সঙ্কল্প আমার মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু একি, আজ আবার এ কি শুনিলাম, নিম্নশ্রেণীর ষোল সতর বৎসরের যুবক, এ জ্ঞান তাহার কোথা হইতে আসিল? এ কি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার? আমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম,—"ভাই, দোষ তোমার পিসীমারই!" বেশী কথা আর বলিতে পারিলাম না, তাহার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আমার মুগ্ধ প্রাণ তাহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া বসিল। আমি যে শিক্ষিত, বিদ্বান বলিয়া মনে মনে এতকাল একটা গর্ব্ব ছিল, তাহা মুহূর্ত্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

পরদিন রামচরণ বাড়ী গেল, বলিয়া গেল শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। দিন চার পাঁচ পরে কত দুঃখ জানাইয়া সে আমাকে একখানি পত্র লিখিল, তাহার পিসীমার গঙ্গালাভ হইয়াছে, কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া শীঘ্রই সে কলিকাতায় চলিয়া আসিবে।

প্রায় মাস দেড়েক পরে একদিন দেখি রামচরণ হঠাৎ আসিয়া হাজির। আমি সানন্দে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। বিশ্রামের পর তাহাকে বাড়ীর কথা সব জিজ্ঞাসা করিলাম, জগদম্বাকে কাহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিল সন্ধান লইলাম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাবু, ভাগ্যে আপনার কথা শুনে গেছলুম, তাই পিসীর সঙ্গে দেখা হলো, নইলে আর হতো না। মরবার আগে বের কথা পিসীমা আর ভুলেন নি। আমি তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাই, তিনি আমাকে ক্ষমা করে গেছেন। কিন্তু এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না যে, আমি এত হতভাগ্য যে তাঁকে সুখী করতে পারলুম না। তিনি বৃথাই আমাকে এত কষ্ট করে মানুষ করেছিলেন। পিসীমার মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধাদি শেষ করে জগার বের সম্বন্ধ স্থির করলুম। পিসীমার হাতে নগদ টাকা কিছু ছিল। শ্রাদ্ধের খরচ করেও কিছু বেঁচে ছিল। তাতেই জগার বের সমস্ত খরচ পত্র চালালুম। বের পরদিন শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় সে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লে,—'দাদা, আমাকে ভুলো না, আমার যে আর কেউ নেই!' তাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লুম,—'আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুই সুখী হবি। তোর দাদা বেঁচে থাকতে তোর কোন কষ্টই হবে না।' পিসীমার ধানজমি ও ঘরবাড়ী সামান্য যা ছিল, সব তার নামে লেখা পড়া করে দিয়ে আমি আপনার কাছে চলে এলুম।"

রামচরণের কথা শুনিয়া আমি তাহাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিলাম। সেই দিন হইতে রামচরণকে সকলের নিকট ছোট ভাই বলিয়া পরিচয় দিতে আমি গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। এখন আমার নিজের কাজেরও সুবিধা হইয়াছে। আমি এক সওদাগরি

আফিসের বড় বাবুর পদ পাইয়াছি। মাসিক বেতন যাট টাকা। স্ত্রীপুত্রকে বাড়ী হইতে আনাইয়া কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া আছি। দুদিনেই রামচরণ নিজের গুণে তাহাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। আমার ছেলে ত তাহাকে 'কাকা' বলিতে অজ্ঞান! স্থির করিয়াছি, রামচরণকে কোনও ব্যবসায়ে লাগাইয়া দিব। আর তাহার বিবাহের জন্য স্বজাতীয় একটি পাত্রীরও অনুসন্ধান করিতেছি, তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিব। তবে সে এখন হইতেই বলিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার বিবাহের সময় জগাকে আনাইতেই হইবে।

বংশরক্ষা

(১)

নানাপ্রকারের মাদুলি ধারণ করিয়া, নানা দেবতার নিকট মানৎ করিয়া ও কালীঘাটে হত্যা দিয়াও যখন ১৮ বৎসর বয়সে বসুদের বৌয়ের সন্তান-সম্ভাবনা হইল না, তখন বাড়ীর গৃহিণীর মুখে আপনা হইতেই একটা বিষাদের রেখা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

* * * *

সত্যলাল বসুদের বাড়ীর একমাত্র ছেলে। তাহার পিতা তাহাকে শৈশবাবস্থায় রাখিয়া অকালে মরিয়া যান। সেই অবধি তাহার মাতা অতি যত্নে তাহাকে লালন-পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা আদৌ সচ্ছল ছিল না। যখন সত্যলালের খুড়া নাবালক ভাইপোর পৈতৃক বাস-ভবনের অংশটুকু ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন, তখন সত্যলালের মাতা অসহায় অবস্থায় কলিকাতায় সত্যলালের দূর সম্পর্কীয়া এক খুড়ীর বাড়ী আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। সত্যলালের খুড়ীমা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সত্যলালকে আদরে ক্রোড়ে স্থান দিয়া পুত্রের অভাবজনিত দুঃখ অনেকটা ভুলিয়া গেলেন। সত্যলালও আলালের ঘরের দুলাল হইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

সত্যলালের খুড়া মহাশয় কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী

ব্যক্তি ছিলেন। মা লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার ঘরে কিছুরই অভাব ছিল না। তবে তাঁহার স্বভাব-চরিত্র আদৌ ভাল ছিল না। তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন। সেই জন্য অকালেই পত্নীর সিঁথির সিন্দুর মুছাইয়া এত সুখের ইহলোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মৃত্যুর সময় তাঁহার ছেলেপিলে কিছুই হয় নাই। তথাপি সত্যলালের খুড়ীমা স্বামীর বাটীতেই থাকিয়া অপর লোকজনের দ্বারা বিষয়কর্ম্ম পরিচালনা করিতেন। তবে প্রিয়জনের বিরহে ও অভাবে তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইত ও প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা মরুভূমি বলিয়া মনে হইত। তাই যখন সত্যলালের মাতা পুত্র লইয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইল, তাঁহার আনন্দের ও সুখের সীমা রহিল না। স্বামীর বংশরক্ষার জন্য পোষ্যপুত্র লইবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এখন সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সত্যলালকেই নিজের ছেলের ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন।

সত্যলাল স্কুলে ভর্ত্তি হইল। কিন্তু অতিরিক্ত আদর পাইলে ছেলেপিলে যেমন অবাধ্য ও পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়, সত্যলালের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। সে নামে মাত্র একবার স্কুলে যাইত, আর অবশিষ্ট সময় গল্পগুজব করিয়া ও বন্ধুদের সঙ্গে তাস পাশা খেলিয়া কাটাইয়া দিত। কিন্তু তাহার একটি বড় গুণ ছিল। পড়াশুনায় অমনোযোগী হইলেও তাহার স্বভাব-চরিত্র যতদূর সম্ভব নির্ম্মল ছিল। তাহার খুড়ীমাও তাহার পড়াশুনা সম্বন্ধে তত গ্রাহ্য করিতেন না; কারণ তাঁহার ধারণা ছিল সত্যলাল বুঝিয়া চলিতে পারিলে তাঁহার স্বামী যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পায়ের উপর পা দিয়া সে বসিয়া খাইতে পারিবে।

এইরূপে ষোড়শ বৎসর বয়সে তৃতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া

সত্যলাল তাহার পাঠ শেষ করিল। তাহাকে সৌভাগ্যবশতঃ কখনও চাকুরির দরখাস্ত করিতে হয় নাই; নচেৎ তৃতীয়শ্রেণী অবধি পড়িয়াও আবেদন পত্রে প্রথম শ্রেণী অবধি পড়িয়াছি ও অর্থসাচ্ছল্য না থাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারি নাই, এরূপ মিথ্যা কথার আশ্রয় লইতে হইত!

পড়া শেষ হইলেই নানাস্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। তাহার খুড়ীমা অনেক দেখিয়া শুনিয়া একটি সুন্দরী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার সহিত তাহার পরিণয় কার্য্য সমাধা করিলেন। লাল টুকটুকে বউ দেখিয়া সকলেরই মনে আনন্দ হইল। সত্যলালের কথা আর বিশেষভাবে কি উল্লেখ করিব? সত্যলালকে সংসারী দেখিয়া তাহার খুড়ীমা বড়ই সুখী হইলেন। তিনি কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহারই স্বামীর এক আত্মীয় তাঁহার ভবনে থাকিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইতেছে ও বংশের ধারা বজায় রাখিয়াছে।

মানুষ ভাবে এক ভগবান করেন আর। সত্যলালের বিবাহের পর ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে তাহার মাতার কাল হইয়াছে। খুড়ীমার আদর-যত্নে সত্যলাল মাতৃবিয়োগজনিত কষ্ট তত বুঝিতে পারিল না। তিনি সত্যলাল ও তাহার স্ত্রীকে নিজ পুত্র ও পুত্রবধূর ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বড় সাধে ছাই পড়িল। ললিতার বয়স ১৮ বৎসর হইল, অথচ তাহার কোনও সন্তান হইবার সম্ভাবনা হইল না; বরং বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের লক্ষণ সকলই স্পষ্টীভূত হইতে লাগিল। সত্যলালের খুড়ীমার দুঃখের সীমা রহিল না। আজ না কাল, এ বৎসর নয় আর বৎসর বৌমার পুত্র-সম্ভবনা হইবে, এই বলিয়া তিনি ছয় বৎসর মনকে

প্রবোধ দিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে বড়ই ভয় হইল; বুঝি তাঁহার আশা-ভরসা সবই নির্ম্মূল হইয়া যায়! তিনি বৌকে কত ঔষধ খাওয়াইলেন, কত মাদুলি ধারণ করাইলেন, নিজে কত ব্রত উপবাসাদি করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না!

(২)

সত্যলালও এ বিষয়ে প্রথম আদৌ উৎকণ্ঠিত হয় নাই। সে স্ফূর্ত্তি করিয়া আমোদে দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিল। কিন্তু ললিতা খুড়ীমার মনের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিল এবং আপনাকেই সেই কষ্টের কারণ মনে করিয়া বড়ই বিষণ্ণ ছিল। সন্তানহীন নারীজীবন ফলহীন পাদপের ন্যায় ব্যর্থ বলিয়া তাহার মনে হইল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার এক উপায় স্থির করিয়া সে একদিন রাত্রে স্বামীকে মনের কথা খুলিয়া বলিল,—"দেখ, বয়স চলে গেল, অথচ ছেলেপুলে কিছুই হলো না। আমার সমান বয়সী মেয়েরা সব দু'তিন ছেলের মা। তোমার ছেলেপুলে না হলে খুড়ীমার কষ্টের সীমা থাকবে না। তিনি কত আশায় আমাদের আদর-যত্ন করছেন যে, আমাদের সন্তান তাঁর স্বামীর নাম বজায় রাখবে। এ সাধ তাঁর পূরণ না হলে আমাদের পাপের ভাগী হতে হবে। তাই একটা কথা তোমাকে বলতে চাই।"

সত্যলালের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কই এ কথা ত এতদিন একবারও তাহার মনে উদিত হয় নাই। বীণার তন্ত্রীতে হঠাৎ করুণ ঝঙ্কার কে দিল! সে বলিয়া উঠিল,—"পাগলের

মত এ সব কি বকছো? মাথা খারাপ হলো নাকি! এই ত সেদিন আমাদের বিয়ে হলো, এর মধ্যে তোমার ছেলে হবার বয়স চলে গেল? এ যুক্তি তোমার মাথায় কে ঢোকালে?" এই বলিয়া সত্যলাল আবেগভরে স্ত্রীর বদনকমল চুম্বন করিল। ললিতা ভাবিল যখন কথা আরম্ভ করিয়াছে, তখন শেষ করিতেই হইবে, মনকে দৃঢ় করিয়া সে উত্তর করিল,—"না, ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। যথার্থই আর আমরা ছেলেমানুষ নই। ভাল মন্দ বুঝবার আমাদের বয়স হয়েছে। আমার দোষে খুড়ীমা এত কষ্ট ভোগ করবেন, নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবেন না! তাঁর এই অসীম ভালবাসার কি এই প্রতিদান! আমি থাকতে তা কখনও হতে দেব না। যা বলি শোন, তুমি আবার বে কর।"

এই বলিয়া ললিতা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সত্যলালও সে কথা শুনিয়া তাহার বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্র-দ্বয় স্ত্রীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। সে করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আবার বিয়ের কথা কেন বলছো ললিতা! আমি কি কিছু অন্যায় করেছি, তাই তুমি আমার উপর রাগ করেছ? এই ছ' বছর আমরা কেমন সুখে কাটিয়ে দিয়েছি। আজ তবে হঠাৎ এ সব কথা কেন উঠছে? তুমি নিশ্চয় জেনো, বিয়ের সময়ও তোমাকে যে স্নেহের চক্ষে দেখেছিলুম, আজও তোমার প্রতি সে ভালবাসা একটুও কমে নি। আবার বে আমি কিছুতেই করতে পারবো না, খুড়ীমাকে সুখী করতেও নয়। তুমি ও সব কথা আর মুখে এনো না!"

ললিতা স্বামীর কথা শুনিয়া মনে মনে বড়ই সুখী হইল। স্বামীর মুখে ভালবাসার কথা শুনিয়া স্ত্রী কখনও তৃপ্ত হয় না। সত্য-

লালের উত্তর শুনিয়া ললিতা আর কিছু বলিল না। রাত্রিও অনেক হইয়াছিল। সত্যলালেরও তন্দ্রা আসিল। ললিতা তখন স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিল,—"ভগবান মনে বল দাও। স্বামীর বিবাহ আমাকেই দিতে হবে। আমার দোষে বংশের নামটা লোপ পাবে, এ কখনই হতে পারে না।" এই বলিয়া সে স্বামীর পদপ্রান্তে ঘুমাইয়া পড়িল। ধন্য নারী, ধন্য তোমার ত্যাগ-মহিমা!

এদিকে সত্যলালের খুড়ীমাও সে রাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই। তিনিও এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপায় মনে মনে ভাবিতেছিলেন। সত্যলালের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়াই যে ইহার একমাত্র পন্থা, তাহা যে তিনি জানিতেন না তাহা নহে। কিন্তু যাহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন, সেই লক্ষ্মীস্বরূপা বধূমাতার কোন্ প্রাণে স্বহস্তে সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই, সত্য-লালকে ছাড়িয়া পুনর্ব্বার পোষ্যপুত্র লওয়া এখন অসম্ভব, তখন অন্য কোন ভাব আর তাঁহার মনে উদিত হইল না। তিনি স্থির করিলেন যে, পরদিন সকালে আহারের সময় সত্যলালকে এ বিষয়ে তিনি সব বুঝাইয়া বলিবেন। আর কালাবলম্ব করা উচিত নহে। কারণ কবে বলিতে কবে তাঁহার ডাক আসিবে! সত্যলালের সন্তান না দেখিয়া গেলে মরণে তাঁহার শান্তি হইবে না, মৃত স্বামীর প্রতিও তাঁহার কর্ত্তব্য সাধিত হইবে না।

পরদিন দুপুরে সত্যলাল যথাসময়ে আহারে বসিল। খুড়ীমা তাহারই সম্মুখে বসিয়া "এটা খা, ওটা খা" বলিতে লাগিলেন। পরে খাওয়া শেষ হইয়া গেলে তিনি সত্যলালকে বলিলেন,—

"বাবা একটা কথা বলবো, কিছু মনে করো না। বৌমার এখনও যখন ছেলেপিলে হলো না, তখন আর যে হবে বলে ত আশা হয় না; তা বাবা, স্বামীর বংশটা লোপ পাবে, তা কেমন করে দেখি: তুই আর একটা বে কর। তোর কোন ভাবনা নেই, বৌমাকে আমি যেমন মেয়ের মত ভালবাসতুম, তেমনই বাসবো; কেবল স্বামীর নামটা যাতে বজায় থাকে, এই চেষ্টা!" সত্যলাল বুঝিল, ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে; গত রাত্রে স্ত্রীর মুখেও এই একই কথা সে শুনিয়াছে; তাহা হইলে বাড়ীতে ইহা লইয়া নিশ্চয়ই একটা আন্দোলন চলিতেছে। সে মুখ নীচু করিয়া বলিল,—"ছোট মা, তুমি অত ভাবছ কেন? এর মধ্যেই কি ওর ছেলে হবার বয়স চলে গেছে?" এই বলিয়া সে চিন্তিত ভাবে আসন ছাড়িয়া উঠিল।

ললিতা আড়ালে থাকিয়া এই কথাবার্ত্তা শুনিল। খুড়ীমা মনের কষ্টে তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না, তাহাও সে বুঝিতে পারিল; সে নিজে উপযাচক হইয়া খুড়ীমার নিকট গিয়া বলিল,—"মা আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক। আমারও তাই মত। বংশ লোপ পাবে, চৌদ্দপুরুষ নরকাস্ত হবে, তা প্রাণ থাকতে ঘটতে দেব না। আপনি পাত্রীর অনুসন্ধান করুন। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে বলছি, এতে আমার অমত হবে না।" খুড়ীমার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন,—ললিতার মুখ গম্ভীর ও দৃষ্টি প্রশান্ত। তিনি মনে মনে বলিলেন, "মা কালী! এমন সতী লক্ষ্মীরও এমন সর্ব্বনাশ হল! তোর লীলা বোঝা ভার!" তিনি সংযত হইয়া ললিতাকে বলিলেন,—"আচ্ছা মা, তাই হবে। তুমি ছেলেকে বুঝিয়ে বলো।

আর তোমার কোন কষ্ট হবে না। তোমাকে যেমন ভালবাসতুম তেমনি বাসবো। কেবল স্বামীর বংশরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে এ কাজ করতে হচ্ছে।"

ললিতা সেই রাত্রে বিবাহ করিবার জন্য স্বামীকে আবার অনুরোধ করিল। সে অনেক করিয়া সত্যলালকে বুঝাইয়া দিল যে, বিবাহ না করিলে, তাহার পাপ হইবে। সামান্য স্ত্রীর সুখের জন্য তাহাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে, এ বড়ই লজ্জার বিষয়! সে আরও বলিল,—"দেখ বিয়েতে আমার কষ্ট হবে না। নতুন বৌকে আমি নিজের ছোট বোনের মত দেখবো।" সত্যলাল বড়ই ফাঁপরে পড়িল। খুড়ীমাব কথা বরং সে অনেকটা অগ্রাহ্য করিতে পারিত, কিন্তু যাহার সুখের জন্য এ প্রস্তাবে সে সম্মত হইতে পারিতেছে না, তাহারই মুখে এ সব কথা শুনিয়া ও বিবাহেব জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া সে একটু বিচলিত হইল। পাপের ভাগী হইতে হইবে, ইহাতে তাহার মনে একটু ভয়ও হইল। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও টলমল করিতে লাগিল। সে বিবাহে সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিল না। ভাবিল,—"বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!"

(৩)

বিবাহে স্বামীর মত করাইয়া ললিতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। খুড়ীমা পাত্রীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। ললিতার মনের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও সে মনকে জয় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে একটি বড়সড় সেয়ানা মেয়ে দেখিয়া পাত্রী নির্ব্বাচিত হইল। পাকা

দেখা, আশীর্ব্বাদ যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। বিবাহের দিন ললিতা নিজ হস্তে স্বামীকে চন্দন পরাইয়া সাজাইয়া গুজাইয়া বরবেশে বিবাহ-সভায় পাঠাইয়া দিল। তাহার মুখে হাসি ও কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া বাড়ীর ঝি-চাকরও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। সত্যলালও একবার নিজ ঘরে বসিয়া গোপনে খুবই কাঁদিয়াছিল। সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিবাহ করিতে চলিল।

ললিতা রাত্রে নিজ ঘরে শুইতে গেল। এতক্ষণ তাহার মনের দুর্ব্বলতা কেহ বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করে নাই! কিন্তু নির্জ্জন ঘরে আসিয়া তাহার স্ত্রীজনসুলভ কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, নিজ চেষ্টায় নিজের সর্ব্বনাশ সে করিয়াছে! এ কার্য্যে সহায়তা না করিলেই বোধ হয় তাহার পক্ষে ভাল হইত। সে একটু বাধা দিলে সত্যলাল বরং খুড়ীমার বাড়ী ও বিষয় ছাড়িয়া অন্য স্থানে আশ্রয় লইত, তবুও সে বিবাহে স্বীকৃত হইত না। কিন্তু পরক্ষণেই ললিতার চমক ভাঙ্গিল। সে ভাবিল, এ কি করিতেছি! এত চেষ্টা করিয়াও আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছি না, এ বড় লজ্জার কথা! এ মহদনুষ্ঠানের আগাগোড়াই যে নীচ স্বার্থের বলিদান! যাহাতে আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহার মনের বল ও উৎসাহ থাকে, তজ্জন্য ভগবানের উদ্দেশে সে জোড়করে প্রার্থনা করিল। ললিতা এবার স্বামীর কথা ভাবিতে বসিল। এতক্ষণ হয় ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নববধূর মুখ দেখিয়া তিনি বোধ হয় দুঃখ-কষ্ট অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছেন, বাসর-ঘরে আনন্দে নিশি যাপন করিতেছেন; এই সব ভাবিতে ভাবিতে ছয় বৎসর পূর্ব্বেকার তাহারও বিবাহের দিন মনে পড়িয়া গেল; সে অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সত্যলাল নববধূর হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিল। ললিতাও তাহার খুড়ীমার সঙ্গে বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইল। পরে প্রশান্ত বদনে ধান-দূর্ব্বা দিয়া নববধূকে আশীর্ব্বাদ করিল। মঙ্গল কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেলে সে সত্যলালকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল,—"কিগো বউ মনের মত হয়েছে ত? অনেক খুঁজে তবে পাত্রী ঠিক করেছি। এখন ঘটক বিদেয় করতে হবে।" সত্যলাল সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। মুখ নীচু করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

নববধূ আট দিন মাত্র থাকিয়া চলিয়া গেল। এই আট দিনই ললিতা সুরমাকে নিজ হস্তে সাজাইয়া সাবান মাখাইয়া গহনা পরাইয়া রাত্রে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিত। সত্যলালেরও প্রথম দু'এক দিন একটু চক্ষুলজ্জা হইত; কিন্তু তারপর হইতে তাহারও স্ফূর্ত্তি বেশ জমিয়া উঠিতে লাগিল। সেও সুরমার সঙ্গ লাভ করিতে উৎসুক। এ ঘটনা ললিতার দৃষ্টি এড়াইল না। "নূতন ফেলিয়া কেবা পুরাতন চায়?" এই প্রবাদ বাক্য সত্যলাল অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিল; পুরুষ মানুষ কি এতই দুর্ব্বলচিত্ত! তাহার মনের ভাব কি এত অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে?

সুরমা চলিয়া গেল, সত্যলালের মন উড়ু-উড়ু হইল। সংসার ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। দিনের মধ্যে দু'এক বার ললিতার নিকট আসিলেও ললিতা বেশ বুঝিতে পারিত যে, সে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেছে না। তাহার মন বড় বিষণ্ণ। যে সত্যলাল বলিয়াছিল স্ত্রীর মৃত্যুর পরও

সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবে না, আজ সে আর স্ত্রীর ছায়াও মাড়াইতে চাহে না। পুরুষ মানুষ এতই অপদার্থ! তাহার কথার কোন মূল্যই নাই—কেবল স্ত্রীলোকের মন-ভোলান ফাঁকা কথা; তাহাতে প্রাণের লেশ মাত্র নাই। তাহাদের প্রেম কেবল মুখে—কথার কথা!

দু'এক দিন অন্তর সত্যলাল নব শ্বশুরালয়ে যাইতে আরম্ভ করিল। তাহার খুড়ীমাও তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। তিনি একদিন ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা বৌমা, সত্য কি আর তোমাকে তত গ্রাহ্য করে না? ছেলেটার মাথা খারাপ হলো নাকি?" ললিতা উত্তর করিল, "না না, তিনি ত রোজই আমার সঙ্গে খুব কথাবার্ত্তা কন, হাসেন, আমোদ করেন।" কিন্তু খুড়ীমা বুঝিলেন ললিতা তাঁহার কাছে সত্য কথা গোপন করিল। এ সব কথা জানিতে পারিলে পাছে কেহ তাহার স্বামীর নিন্দা করে, সেই জন্যই সে তাহা প্রকাশ করিল না।

ললিতা দেখিল যে সুরমাকে না আনাইলে সত্যলালের মন স্থির হইবে না। বিবাহের পর কন্যার পিতৃগৃহে না থাকাই বাঞ্ছনীয় এই কথা খুড়ীমাকে বলিয়া ভাল দিন দেখিয়া সে সুরমাকে আনিল। ললিতার এই কার্য্যে সত্যলাল বড়ই সন্তুষ্ট হইল এবং হাসিমুখে ললিতার সহিত উপযাচকভাবে দেখা করিয়া তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করিল। সত্যলাল অধিকাংশ সময়ই সুরমার সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিয়া কাটাইতে লাগিল। ললিতাই সংসারের সব কাজ দেখিত, সুরমাকে আদৌ খাটিতে দিত না; সুরমাও সারাদিন

পশম বুনিয়া নভেল পড়িয়া ও স্বামীর সহিত গল্পগুজব করিয়া কাটাইতে লাগিল। ললিতা স্বামীর স্নানাহারের যোগাড় করিত, শয্যারচনা করিয়া দিত। সে প্রতিদান কিছুই চায় না, স্বামী যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সে নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াও স্বামীর উপর স্ত্রীর ন্যায্য দাবি সব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া সেই কার্য্য করিতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প! সুরমাকে সংসারের কোনও কাজ দেখিতে হইলে পাছে স্বামীর আমোদের সময় কমিয়া যায়, তিনি অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে ললিতা নিজেই সংসারের কাজ-কর্ম্ম সব দেখিত। সুরমাও তাহাই চায়; সে রাজরাণী হইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া রহিল।

(৪)

সাত দিন হইল সুরমা আসিয়াছে। সত্যলাল গত ছয় রাত্রিই সুরমার সহিত কাটাইয়াছে; এমন কি দিনের বেলাও একবার ললিতার কাছে আসে নাই। সাত দিনের দিন তাহার খুড়ীমা ললিতাকে জোর করিয়া রাত্রে স্বামীদর্শনে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতাকে দেখিয়া সত্যলাল মুখ ফিরাইল। স্বামীর নৈরাশ্য ও কষ্ট সতীর বক্ষে শেলসম বিঁধিল। ললিতা শয্যাপ্রান্তে গিয়া স্বামীর পা টিপিয়া দিতে ও পাখার বাতাস করিতে লাগিল। পরে স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার চরণদ্বয় মস্তকে ধরিয়া বলিল,—"যেন ঐ চরণেই আমার মতিগতি অচলা থাকে।" পরে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া সুরমাকে পাঠাইয়া দিল।

সুরমা ঘরে ঢুকিয়াই চুম্বনস্পর্শে স্বামীকে জাগাইল।

সত্যলাল জাগিয়া উঠিয়া হাতে আকাশের চাঁদ পাইল, এবং মনে মনে বুদ্ধিমতী ললিতার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। সত্যলাল আবেগভরে পত্নীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সুরমা তাহাতে বাধা দিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল,—"যদি আমাকে ভালই লাগে না, ত বিয়ে করলে কেন? এতদিন ধরে স্বামীসুখ ভোগ করেও দিদির তৃপ্তি হল না? আমি দুদিন এসেছি তাও তাঁর অসহ্য হলো। আমাকে এমন করে বিয়ে করে মজান, আমার সর্ব্বনাশ করা তোমার উচিত হয় নি।" সত্যলাল সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর করিল,—"না, সত্যি বলছি, আর এমন কখন হবে না, আজ আমাকে ক্ষমা কর।" সুরমাও তখন দশনপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করিয়া উত্তর দিল,—"আচ্ছা, দেখা যাবে, পুরুষের কথার দৌড় কত!"

পরদিন হইতে সত্যলাল যেন একটু রুক্ষভাব ধারণ করিল। ললিতাকে দেখিলেই সে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাইত। "রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম" পুরুষমানুষের ইহাই প্রেম! ইহারই নাম ভালবাসা! ললিতা বুঝিল যে তাহারই জন্য স্বামী নির্ব্বিঘ্নে নিঃসঙ্কোচে সুরমার সহিত সুখভোগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ভোগের পথে সে কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ভাবিল, তাহাকে মরিতেই হইবে। সত্যলাল ও সুরমার মধ্যে তাহার আর স্থান নাই। নিজের জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হইল। অপুত্রবতী স্ত্রীলোকের যখন জ্ঞান হয় যে, স্বামীর সুখবিধানের জন্যও তাহার অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন নাই, তখন শরীরের প্রতি তাহার আর আদৌ লক্ষ্য থাকে না। ললিতারও অবস্থা

তদ্রূপ। অসময়ে খাওয়া, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রভৃতিতে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সত্যলাল তাহা আদৌ লক্ষ্য করিল না, তাহার খুড়ীমাও ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। সুরমার সন্তান-সম্ভাবনা হইল। ললিতার আনন্দের সীমা রহিল না, সত্যলালের ত কথাই নাই! তাহার খুড়ীমাও বংশরক্ষার আশায় সব দোষ ভুলিয়া গিয়া সুরমার সেবার প্রতি যত্নবতী হইলেন। কিন্তু ললিতা ক্রমেই অকর্ম্মণ্য ও গতিশক্তিরহিত হইয়া পড়িল। তাহার ভগ্নশরীরে প্রবল জ্বর দেখা দিল। খুড়ীমা তখন সত্যলালকে অনেক অনুরোধ করিয়া পাড়ার একজন হাতুড়ে ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার তাহার নাড়ী টিপিয়া ও পেট দেখিয়া বলিয়া গেল, —"কোন ভয় নেই, সামান্য সর্দ্দিজ্বর! যা ওষুধ দিলুম, তাতে দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।" কিন্তু ঔষধে কোনই ফল হইল না। ললিতার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। তাহার প্রাণ-সংশয় হইয়া দাঁড়াইল।

সে দিন সকাল হইতে বাড়ীতে একটু চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে! সুরমার প্রসববাথা ধরিয়াছে। সত্যলাল তাহাকে লইয়া বড় ব্যস্ত। তাহার খুড়ীমাও উৎফুল্ল অন্তঃকরণে ঘন ঘন সুরমার কাছেই যাইতেছেন, ললিতার প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না। ললিতাও নিজের রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া কখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, সেই আশায় কান খাড়া করিয়া রহিয়াছে। সে বুঝিয়াছে যে আর বেশী-ক্ষণ তাহার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ জ্বলিবে না। হঠাৎ শিশু পুত্রের জন্ম ঘোষণা করিয়া শঙ্খধ্বনি হইল। ললিতার পাণ্ডু ওষ্ঠাধরে

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এবার স্বামীর প্রতি, খুড়ীমার প্রতি, স্বামীর পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। সে এখন অনায়াসে যাইতে পারে। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, নবজাত শিশুকে দেখে, কিন্তু তাহার শয্যার পাশে তাহাকে আনিলে পাছে শিশুর অকল্যাণ হয়, বংশরক্ষার পথে ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে সে মনের আশা মনেই পোষণ করিয়া শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিল। স্বামীকে একবার শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু এ সময় এ সংবাদ দিয়া তাঁহার সুখে ব্যাঘাত করিতে সে ইতস্ততঃ করিল ও মনে মনে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া স্বকৃত দোষের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, সতীসাধ্বী ধীরে ধীরে শান্ত অন্তঃকরণে চক্ষু মুদিল; নন্দনকাননের পারিজাত, ধরার পঙ্কিলতার সংস্পর্শে আসিয়া অকালেই ঝরিয়া পড়িল!

* * * * * *

খুড়ীমা তাহাকে সুসংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি আসিবার পূর্ব্বেই ললিতার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তিনি "বৌমা" বলিয়া কাঁদিয়া শয্যার উপর পড়িলেন,—"মা সতীলক্ষ্মী, কর্ত্তব্য শেষ করে অভিমানে চলে গেলি মা!"

নবজাত শিশুপুত্রের ক্রন্দনধ্বনিতে সে আর্ত্তনাদ সত্যলালের কানে পৌঁছিল কিনা বলিতে পারি না।

জীবন্ত সমাধি

আমরা খ্রীষ্টীয় ষোড় শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা বলিতেছি। তখন বঙ্গাধিপ আলাউদ্দীন হুসেন সাহ গৌড়ের বাদসাহী তক্ত অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। আরাকান প্রদেশের মগদস্যুগণ প্রজাগণের উপর ভীষণ অত্যাচার ও উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। হুসেন সাহ চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তাহাদেরই অত্যাচারের ফলে দক্ষিণ বঙ্গের সমৃদ্ধ জনপদচয় সুন্দরবনে পরিণত হয়। লুটপাট করিয়া পলায়ন করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই মগদস্যুগণ কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, দুর্ব্বল প্রজাগণের উপর তাহারা অমানুষিক অত্যাচার করিত। ইহারা সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণদিগের জাতিনাশ করিতেও চেষ্টা পাইত। ফলে এই সময়ে মগদস্যুদিগের উৎপীড়নে বাঙ্গালার নিরীহ অধিবাসিবৃন্দ নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের ধনপ্রাণ আদৌ নিরাপদ ছিল না। দেশে এক প্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুর্দ্দিনে গ্রামবাসিগণের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের হিতার্থে একজন সামান্য বাঙ্গালী জমিদার, এই মগতস্করদিগের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রাজা রামচন্দ্র খাঁ।

রামচন্দ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং "গুড়" উপাধিধারী ছিলেন। মধ্যবঙ্গ রেলপথে জেলা যশোহরের অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন বেনাপোল নামক ষ্টেশনের নিকট রাজবাড়ী বলিয়া একটি

সুপ্রসিদ্ধ স্থান আছে। এই গ্রামে অন্যূন সার্দ্ধচারিশতগজ সম-চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের উপর তাঁহার বাস্তুভিটা, প্রাচীর পরিখাবেষ্টিত বিশাল প্রাসাদের জঙ্গলময় ধ্বংসস্তূপ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়; যদিও ইতিহাসে অনুসন্ধান করিলে ইহার কোনও সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না, তথাপি পুঞ্জীকৃত ইষ্টকখণ্ড ও প্রকাণ্ড গড় দৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয় যে, এককালে নিশ্চয়ই কোনও প্রবলপরাক্রান্ত জমিদার এই স্থানে বাস করিতেন ও শত্রুদমনার্থ এই গড় নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।

লোকে উহাকে রাজা রামচন্দ্রের বেড় বলিয়া উল্লেখ করে। জনবাদ প্রচলিত যে, এই বেড়ের মধ্যে প্রচুর ধনরত্ন প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, কিন্তু সে অভিশপ্ত অর্থসম্পদ্ স্পর্শ করিলেই মৃত্যু নিশ্চিত। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের নিকটে ও দূরে অনেকগুলি মজা দীঘিও দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, প্রজাগণের জলকষ্টনিবারণার্থ তিনি বহুসংখ্যক বৃহৎ দীঘির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

যোড়শ শতাব্দীতে এই স্থানটি এক সমৃদ্ধশালী গণ্ডগ্রামরূপে বিরাজ করিত—রামচন্দ্র খাঁ তাহার মালিক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার গৃহে রাখাল নামধারী একজন মুসলমান-বালক রাখালের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। একদিন মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, অথচ রাখাল গোচারণ-মাঠ হইতে ফিরিল না দেখিয়া রামচন্দ্র তাহার অন্বেষণে গিয়া দেখিলেন, বালক ক্লান্ত হইয়া এক বিশাল বৃক্ষের শীতল ছায়ায় শুইয়া বিশ্রাম করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে এবং এক বৃহৎ বিষধর সর্প তাহার শিয়রে ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে সূর্য্যের প্রখর

কিরণ-তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে; ইহা দেখিয়াই রামচন্দ্র বুঝিলেন, এ বালক একদিন নিশ্চয়ই রাজসিংহাসনে আসীন হইবে। পর দিন তিনি তাহাকে পাথেয় সহ বিদায় দিলেন। বালক যাত্রার পূর্ব্বে অভিজ্ঞানস্বরূপ আপনার পাঁচুনিটি রামচন্দ্রের নিকট রাখিয়া রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

অদৃষ্টের জোরে এই বালক সত্যই একদিন গৌড়ের বাদসাহ হইয়া উঠিলেন; কথিত আছে, বাদসাহ হুসেন সাহকে এই জন্যই কেহ কেহ রাখাল বাদসাহ বলিয়াও অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র এ সংবাদ পাইবামাত্র সেই অভিজ্ঞানসহ গৌড়ে যাত্রা করিলেন। রাখাল বাদসাহ হইয়াও প্রতিপালকের কথা আদৌ বিস্মৃত হয় নাই। তিনি রামচন্দ্রকে যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। রামচন্দ্র কিছুদিন রাজসভায় বাস করিয়া রাজোপাধিভূষিত ও নিকটবর্ত্তী পরগণাগুলির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তিনি প্রবল প্রতাপে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সেই ভীষণ অত্যাচারের দিনে, এই প্রজাবৎসল পরাক্রান্ত জমিদার যথাসাধ্য দেশবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি নিজে একজন সাহসী ও নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে বহুসংখ্যক পাইক সৈন্য ও কতিপয় অস্ত্রধারী শিক্ষিত সৈনিকও ছিল।

বৈষ্ণবগ্রন্থে আমরা তাঁহাকে বৈষ্ণববিদ্বেষী বলিয়া দেখিতে পাই। তাহার রাজত্বের সময় যবন হরিদাস তাঁহার রাজধানীর সন্নিকটে আগমন করেন। রামচন্দ্র বোধ হয় গোঁড়া শাক্ত ছিলেন।

তজ্জন্য বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষবশতঃই হউক কিংবা যবন হইয়া বৈষ্ণবের আচার অবলম্বন করিয়াছে, যে কারণেই হউক হরিদাসের আগমনসংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া আদেশ করিলেন,—

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥

কথিত আছে, নানারূপ অমানুষিক উপায়ে হরিদাসকে স্বীয় কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত করিতে তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হরিদাস গভীর ও জনহীন অরণ্যের মধ্যে আসিয়া এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ভজন-সাধন করিতেছিলেন। তাঁহার ভজন-সাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য তিনি তথায় এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী বারাঙ্গনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐকান্তিকা ভগবন্নিষ্ঠা দেখিয়া বারাঙ্গনা নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া স্বকৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্তচিত্তে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিল। হরিদাস তাহাকে হরিনামে দীক্ষা দিয়া তাহাকে নিজের কুটীরে রাখিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শুনিতে পাওয়া যায় নীচপ্রকৃতি বারাঙ্গনার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়াও রামচন্দ্রের চৈতন্য হয় নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, নিত্যানন্দ প্রভু যখন প্রেম প্রচার করিতে গৌড়ে পদার্পণ করেন, তখন রামচন্দ্রের অশিষ্ট ব্যবহারে তিনি বড়ই ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবেরা তাঁহার নিন্দা করিতে পারেন কিন্তু তিনি যে একজন স্বদেশবৎসল বীর রাজা ছিলেন, সে

বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র একদিন দূতমুখে শুনিলেন যে, মগদস্যুগণ তাঁহার অধীনস্থ এক গ্রাম লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি দ্রুত সৈন্যচালনা করিলেন, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সেদিন সেখানে আর পৌঁছিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র পরদিন ঊষাকালেই সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন,—সৈন্যেরা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও ভীমবিক্রমে শত্রুগণকে আক্রমণ করিল। মগেরা যুদ্ধে পরাজিত হইল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে সে অঞ্চল হইতে দূর করিয়া দিলেন—গ্রামে শান্তি বিরাজ করিল।

পলাতক গ্রামবাসিগণ একে একে আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া নূতন কুটীর নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র একপক্ষ কাল তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রজাগণের সব সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে, রণক্লান্ত সৈন্যগণ প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

এদিকে গৌড়ের বাদসাহ হুসেনসাহ যতদিন রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, ততদিন রামচন্দ্রের সকল ঔদ্ধত্যই তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে. তাঁহার পুত্র আর রামচন্দ্রকে সেরূপ অযথা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি যথারীতি রাজকর দাবী করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু বলদৃপ্ত রামচন্দ্র সে আদেশ পালন করিলেন না। বাদসাহ মহা রুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। শত্রুবাহিনী বিপুল ছিল। রামচন্দ্র অল্পসময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। ইচ্ছামতীর তীরে দুইদলের সংঘর্ষ

ঘটিল। রামচন্দ্র যতই প্রবল জমিদার হউন না কেন, গৌড়ের বাদসাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার দলস্থ প্রায় সকল সৈন্যই নিহত হইল! রামচন্দ্রের সৌভাগ্যরবি ইচ্ছামতীর নীলাভ জলে চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল!

সে সময়, অনেক জমিদারের গৃহমধ্যেই মৃত্তিকাগর্ভে একটি গুপ্তগৃহ বা "পাতরাজ" থাকিত। শত্রুগণ বাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসিলে, এই ঘরের অস্তিত্ব কিছুতেই জানিতে পারিত না। তবে প্রধান অসুবিধা এই ছিল যে, ভিতর হইতে ইহার দ্বার রুদ্ধ করিবার উপায় ছিল না,—বাহির হইতেই বন্ধ করিতে এবং বাহির হইতেই খুলিয়া দিতে হইত। মুসলমান সৈন্যগণ তাঁহার প্রাসাদোপম বাটী আক্রমণ করিলে, রামচন্দ্র নিরুপায় হইয়া সপরিবারে এই গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কালু নামে এক বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য ছিল। সেই প্রভুর গুপ্তগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক নারিকেল বৃক্ষে লুক্কায়িত রহিল,—শত্রুরা প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেলে, সে গুপ্তগৃহের দ্বার খুলিয়া দিবে। মুসলমান সৈন্যগণ রামচন্দ্রের প্রাসাদ লুঠ করিয়া সব লইয়া চলিয়া গেল। তখন কালু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বংশীধ্বনি দ্বারা প্রভুকে সঙ্কেত করিল যে, শত্রুরা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ দুইজন মুসলমান সৈন্য তখনও পশ্চাতে পড়িয়াছিল। তাহারা বংশীরব শুনিয়া সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। শেষে নারিকেল বৃক্ষোপরি সেই ভৃত্যকে দেখিয়া তাহাকে শরবিদ্ধ করিল। কালু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দীঘিতে পড়িয়া গেল। গুপ্তগৃহও চিরতরে রুদ্ধদ্বারই রহিয়া গেল! সাতদিন পরে গ্রামবাসিগণ ফিরিয়া আসিয়া গুপ্তগৃহের

অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। রামচন্দ্র খাঁ সপরিবারে সেই গুপ্তগৃহেই জীয়ন্তে সমাধি-নিহত রহিয়া গেলেন! শিশুর কাতর ক্রন্দনে, স্ত্রীলোকের আকুল রোদনে পাতরাজ যে কিরূপ করুণা-মুখরিত হইয়াছিল,—অনাহারে ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাহারা যে "কালু!—কালু!" বলিয়া প্রাণপণে কি মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে!

রামচন্দ্রের পরিজন সহ জীয়ন্ত সমাধি হইল,—তাহাদের স্মৃতি এখনও সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। রামচন্দ্রের প্রাসাদগড়ে ভগ্নাংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গুপ্তগৃহের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। যে দীঘিতে কালুর মৃতদেহ পড়িয়াছিল, সে দীঘিটি অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এখনও "কালুর দীঘি" নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। জনশ্রুতি যে আজিও গভীর নিশীথে, গুপ্তগৃহ হইতে কাহার উচ্চধ্বনি নিঃসৃত হয়—"কালু আমাদিগকে বাহির কর!" আর সেই অন্ধকারমধ্যে প্রেতবৎ দণ্ডায়মান পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চশীর্ষ নারিকেল বৃক্ষ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া যেন বলিতে থাকে, "আর তোমাদের বাহিরে আসা হইবে না; বাঙ্গালীর সাহস-সুষমা ঐ পাতালপুরেই নিদ্রিত থাকুক!"

প্রত্যাবর্ত্তন

(১)

"সত্যি, আমার ন্যায় সুখী কে? তোমার মত রমণীরত্নহার যার কণ্ঠদেশে শোভা পাচ্ছে, তার আবার কিসের দুঃখ? সংসারের সকল কষ্টই আমি তোমার মুখ চেয়ে সহ্য করতে পারি; কিন্তু আমার মত হতভাগ্যের হাতে পড়ে, না জানি তোমাকে কত কষ্টই ভোগ করতে হচ্ছে!"

সতী স্বামীর হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া এরূপভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইল যেন সে বলিতে চায়,—"প্রভু, পতির প্রেমলাভ করাই নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই দুর্লভ প্রেমের তুলনায় ঐশ্বর্য্য, মান-সম্ভ্রম সবই তুচ্ছ বলে মনে হয়। এমন সচ্চরিত্র স্বামীর প্রাণভরা ভালবাসা পেয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে; আমি আর কিছুই চাই না। তবে বড় ভয় হয়, বরাতের দোষে পাছে সব হারিয়ে ফেলি। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বস্ব ধন, তোমার ঐ পা দুখানি সেবা করতে করতেই পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারি।" এ কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রেমময়ী সাধ্বীর চক্ষু দু'টি প্রেমনীরভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পতিভক্তিবসে তাহার হৃদয় আপ্লুত হইল!

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। কোন পল্লীগ্রামের একটী ভগ্নপ্রায়

দ্বিতলবাটীর ছাদে বসিয়া দুইজন যুবক যুবতী এইরূপ কথোপ-কথন করিতেছিল। তখন শরতের স্বচ্ছ নীলাকাশে পূর্ণিমার শুক্লশশী হাসিয়া বেড়াইতেছিল। বিশ্বপ্রকৃতি রজতধবল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারায় স্নাত হইয়া দম্পতীর মনে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেছিল।

যুবতীর মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যুবক আত্মহারা হইয়া প্রেমার্দ্রকণ্ঠে বলিল,—"যথার্থই এমন রমণীরত্ন দেবতারও বাঞ্ছনীয়। তোমার কোনও ভয় নেই। যতদিন বেঁচে থাকবো তোমা ছাড়া আর কেউই এ হৃদয়মধ্যে স্থান পাবে না। তোমার প্রেমধারা জীবনে মরণে চিরদিনই সমভাবে সেখানে প্রবাহিত থাকবে। মানুষ জীবনে একবারই ভালবাসে। কবি যথার্থই বলে গেছেন—

জীবনে বারেক আসে প্রেমের স্বপন ;
সে স্বপন থাকে থাক্, অথবা ভাঙ্গিয়া যাক্,
হৃদয়েরে করে যায় দেবনিকেতন।"

বলিয়া যুবক আবেগে পত্নীর আরক্ত গণ্ডস্থলে চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

(২)

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বিলাসপুর গ্রামের দত্তবংশ এক সময়ে খুব প্রতিপত্তিশালী ছিল। অর্থে, মানে প্রতাপে ইহার সমকক্ষ পার্শ্ববর্ত্তী দুই তিন গ্রামের মধ্যে আর কোনও বংশ ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। আজ যাহারা পার্থিব সুখ-সম্পদের অধীশ্বর, অদৃষ্টচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে কাল

তাহারা পথের ভিখারী! চঞ্চলা লক্ষ্মী কখন চিরকাল কাহারও প্রতি সদয়া থাকেন না। তাই দত্তবংশের প্রতিপত্তি ও বিভবসমূহ অনন্তকালের সর্ব্বগ্রাসী সাগরমধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আমাদের এই কাহিনীর নায়ক হরিদাস দত্তের পিতা একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মরাগারুণ জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল দেখিলে সকলেরই মন স্বতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যাইত। তাঁহার সেরূপ অর্থবল না থাকায় তিনি ইচ্ছানুরূপ সকল সৎকার্য্যই সম্পাদন করিতে পারিতেন না এবং সেই জন্য মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ ছিলেন। একমাত্র পুত্র হরিদাসকে তিনি যথাসাধ্য শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত পুত্রের অমূল্য সচ্চরিত্র-গঠনের সহায়তা করিয়া তাহাকে পিতার উপযুক্ত সন্তান করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তাঁহার যৌবনের শেষভাগেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসার লোকাভাবে অচল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকে দত্ত-মহাশয়কে পুনর্ব্বার কোন চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া কন্যার পিতাকে দায়মুক্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মভীরু দত্ত মহাশয় তাহাদের কথায় কোন কর্ণপাত না করিয়া পরিহাস করিয়াই তাহা উড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং শেষে নিরুপায় হইয়া অল্পবয়সেই পুত্রের বিবাহ দিলেন।

পুত্রবধূ কালিদাসী রূপে গুণে অনুপমা ছিল। একাকী সমস্ত গৃহস্থালীর কার্য্য, শ্বশুর স্বামী প্রভৃতি সংসারের সকলকে যথাযোগ্য সম্মান, আদর, সেবা ও যত্ন করিয়া, অনুচরবর্গকে স্নেহ ও মিষ্টবাক্যের দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিল।

দত্ত মহাশয় বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সংসারের মায়া কাটাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। একদিন হঠাৎ জীবন সন্ধ্যায় ভবের হাটে বেচা-কেনা শেষ করিয়া পোটলা-পুটলি বাঁধিয়া পরপারে যাইবার জন্য খেয়াঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাতি-নাতনীর মুখদর্শন আর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্র ও পুত্রবধূকে নিকটে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন,—"দেখ, তোমাদের জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলুম নি। হরিদাসের একটি চাকরি করে দিয়ে যেতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতুম। তোমরা ছেলে মানুষ, এখনও সংসারের জ্ঞান জন্মায় নি। এই অকূল ভবসাগরে ভগবানের রাতুল চরণই একমাত্র কূল। বিপদে পড়লে তাঁকে ডাকবে, তিনিই বিপদ থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।" দত্ত মহাশয় হরিনাম জপিতে জপিতে ভবখেলা সাঙ্গ করিলেন।

নিঃসহায় হরিদাস পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও পারলৌকিক কার্য্যসমূহ সাধ্যমত সম্পাদন করিয়া বড়ই চিন্তিত হইল। সংসারের সমস্ত ভার তাহার মস্তকে পড়িয়াছে। তাহার পিতা যা যৎসামান্য অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাও শ্রাদ্ধে সব খরচ হইয়া গিয়াছে। পিতার আদেশানুসারে হরিদাস অনাথের সহায় দীনবন্ধুকে ডাকিতে লাগিল। যিনি জীবের প্রাণ দিয়াছেন, তিনিই তাহার অন্নের সংস্থান করিয়া দিলেন। গ্রামের গুণগ্রাহী জমিদার তাহার স্বর্গগত পিতার খাতিরে ও পুত্রের গুণে আকৃষ্ট হইয়া হরিদাসকে তাঁহার জমিদারীতে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের একটি চাকুরি করিয়া দিলেন।

(৩)

দম্পতী মনের সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। লক্ষ্মীস্বরূপিনী কালিদাসীর সুবন্দোবস্তে এই সামান্য বেতনেও সংসার বেশ সচ্ছলে চলিতে লাগিল। অভাবজনিত কষ্টসমূহকে তাহারা পরস্পর নির্ম্মল প্রেমরাশির আদান-প্রদানের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিল। হরিদাস সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কালিদাসীও একাকিনী সমস্ত গৃহকার্য্য শেষ করিয়া স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাটুকু লইয়া বসিয়া থাকে। দু'জনে মিলিত হইলেই উভয়ের শারীরিক ক্লেশসমূহ দূর হইয়া যায়। মানসিক স্ফূর্ত্তি ও নির্ম্মল আনন্দ অবসন্ন প্রাণকে আবার তাজা করিয়া তুলে।

তাহাদের পারিবারিক জীবনের সুখের কথা আলোচনা করিলে যথার্থই মনে হয় যে, সুখ অর্থে হয় না, উহা মনের জিনিষ। পিতার আদেশ অনুসারে তাহারা সংসারের কর্ত্তব্যগুলি যতদূর সম্ভব সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। যথাসাধ্য প্রতিবাসিগণের উপকার করিয়া, সকলকে মিষ্ট বাক্য দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া ও সদা সৎপথে থাকিয়া তাহারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। দম্পতী ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সংসার-সমুদ্রে তাহাদের ছোট তরণীখানি ভাসাইয়া দিল। অনন্তশক্তিসম্পন্ন কর্ণধারের হাল ধরিবার গুণে ও পুণ্যপালে প্রেমের বাতাস লাগায় তরণীখানি সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভবসমুদ্রে ভাসিয়া চলিল।

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা যে যুবক-যুবতীর প্রেমালাপের কথা বলিয়াছি, তাহারা আমাদের এই হরিদাস ও তাহার প্রেমময়ী

পত্নী কালিদাসী। যথার্থই হরিদাসের সহিত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা করে যে, এমন সতীলক্ষ্মী যাহার ঘরে বাঁধা, তাহার আবার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব ?

(৪)

ক্রমে তাহাদের আনন্দময় গৃহে শিশুর স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়া উঠিল। কালিদাসী এক কন্যাসন্তান প্রসব করিল। তাহাদের সংসার-সমুদ্রে সুখের তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। কন্যা জন্মাইবার দু'চারদিন পরেই হরিদাসের পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়িয়া গেল। কন্যাটি রূপে গৃহ আলোকিত করিয়াছে, আবার সুলক্ষণা বলিয়া তাহার নাম অন্নপূর্ণা রাখা হইল। মেয়েটিকে দেখিলেই মনে হইত যেন, স্বয়ং অন্নপূর্ণা দীনভক্তের অভাব মোচন করিবার জন্য কন্যারূপে তাহার গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন !

*　　*　　*　　*

দিন বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু এত সুখ বুঝি মানুষের অদৃষ্টে সহ্য হয় না, কালিদাসীর ত সহিল না ! অন্নপূর্ণার বয়স যখন আড়াই বৎসর, কালিদাসী এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া কঠিন সূতিকারোগে আক্রান্ত হইল। হরিদাস যথাসাধ্য তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল ; কিন্তু কোন ফলই হইল না। রোগ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়া শেষ জবাব দিয়া গেল।

হরিদাস প্রমাদ গণিল। সে বুঝিল যে, তাহার সুখের কপাল ভাঙ্গিয়াছে ! এমন সোণার সংসার এত শীঘ্রই অনলে পুড়িয়া

যাইবে ? সে যে এখনও তৃষ্ণাতুর, বারিপানের জন্য জলদের প্রয়োজন, বজ্রপাত হইতেছে কেন, সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। লীলাময়ের অনন্তলীলার এক কণাও বুঝিবার সাধ্য অতি বড় জ্ঞানীরও নাই, আর হরিদাস ত ছার ! অদৃষ্টের উপর সব নির্ভর করিয়া সে চিন্তা হইতে নিরস্ত হইল। কিন্তু কালিদাসীর মৃত্যুর কথা ভাবিতেও তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিত, সে জগৎ শূন্য দেখিত।

তখন জ্যৈষ্ঠ মাস ; গ্রীষ্মকাল। একদিন রাত্রে ঘরে বড় গরম হইলে কালিদাসী স্বামীকে বাগানের দিকের জানালাটা খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিল। হরিদাস প্রথম তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না, বলিল,—"তোমার রোগা শরীর, ঠাণ্ডা লাগান ভাল নয়।" কালিদাসীর পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাসির রেখা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। তাহার অর্থ এই যে, "নাথ ! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, আমাকে যেতেই হবে। তোমার কি সাধ্য যে আমাকে ধরে রাখ !" কালিদাসী জিদ করিলে হরিদাস অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানালাটা একটু খুলিয়া দিল।

চাঁদের আলো জানালার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। চন্দ্রালোকে প্রিয়তমা পত্নীর রোগজীর্ণ শরীর, তাহার জ্যোতিঃহীন নয়নদ্বয় দেখিয়া হরিদাসের নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। সেই তপ্ত অশ্রুজলের দু'এক বিন্দু কালিদাসীর হাতের উপর পড়িল। পতিব্রতা সতী স্বামীর মনোবেদনা বুঝিতে পারিয়া তাহার নয়ন-জল মুছাইয়া দিয়া বলিল,—"ছিঃ ! তুমি কাঁদছো ? পুরুষমানুষ এত দুর্ব্বলচিত্ত হলে হবে কেন ? ছেলেমেয়েদের কে সান্ত্বনা দেবে ? আমার কি যাবার সাধ ? এমন স্বামী, কন্যা, শিশু পুত্র ছেড়ে

জীবনের সাধ অপূর্ণ রেখে কে যেতে চায় ?" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুদু'টি জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে নেত্রজল সম্বরণ করিতে পারিল না।

যে স্বামীকে বিবাহের পর হইতেই সে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছে, যাঁহার তিলমাত্র সুখ বিধানের জন্য কালিদাসী তাহার জীবনের সব সুখদুঃখ অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে পারিত, আজ জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সে প্রাণ ভরিয়া একবার স্বামীকে দেখিয়া লইল। যতই দেখিতেছে, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। পরে স্বামীর হাত দু'খানি নিজের বক্ষের উপর রাখিয়া বলিল,—"তোমার চরণধূলি আমার মাথায় দাও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন পরজন্মে আবার তোমাকেই স্বামী রূপে পাই ; কিন্তু ভগবানের নিকট এক প্রার্থনা যেন এমন করে প্রাণের জিনিষদের ফেলে অকালে আর যেতে না হয় ! এ কষ্ট ভুক্তভোগীই জানে, কাকেও জানাবার নয়। তোমাকে সুখী করতে পারলুম না, বড় দুঃখ রয়ে গেল। কত দোষ করেছি, ক্ষমা করো। একবার বল যে, আমার উপর তোমার কোনও রাগ নেই। আর এতদিন যা বলে এসেছ, যা শুনে কখনও তৃপ্ত হয়নি, নারী-জীবনের যা শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, যে কথা একবার শুনবার জন্যে কত হতভাগিনী সারাজীবন উৎসুক হয়ে থাকে, আজ একবার বল যে তুমি আমাকে ভালবাস ! আর একটি অনুরোধ আছে ; দেখো, আমার অবর্ত্তমানে যেন ছেলে মেয়ে দুটি পর হয়ে না যায় ; একমুঠো ভাতের জন্যে লোকের দ্বারে দ্বারে যেন লাঞ্ছিত হয়ে না বেড়ায়।"

কালিদাসীর শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে আর কথা

বলিতে পারিল না। হরিদাস এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সব শুনিতেছিল। কালিদাসী নীরব হইতে তাহার চৈতন্য হইল। সে পত্নীর শীর্ণ বদনমণ্ডলে শেষ চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া বলিল,—"পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও বলছি যে আমি চিরদিন তোমারই থাকবো। জীবনে তোমাকে ভালবেসেছি, তোমার"—বলিতে বলিতে হরিদাসের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল; তাহার বাষ্পরোধ হইবার উপক্রম হইল। একটু শান্ত হইয়া সে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল,—"তুমি চলে গেলেও তোমার প্রতিমা এই হৃদয়াসনে বসাইয়া পূজা করবো। যতদিন বাঁচবো তোমারই ধ্যানে দিন যাপন করবো।" গগনে সুধাকর হাসিতে হাসিতে মেঘের মধ্যে লুকাইয়া গেল। বোধ হয়, তাহার হাসির অর্থ এই যে, অনেক লোকই মুখে এ কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু দু'দিন না যাইতে যাইতে সবই ভুলিয়া যায়।

* * * *

কালিদাসী বাঁচিল না। পুত্রকন্যাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া, স্বামীর চরণতলে মস্তক রাখিয়া, কালিদাসী ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন সোণার সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হরিদাস স্বর্ণপ্রতিমাকে শ্মশানক্ষেত্রে ভস্মীভূত করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে ভস্মাবশেষ বাঁধিয়া ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় টলিতে টলিতে নিরানন্দ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আজ তাহার সমস্ত সংসার অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হরিদাস পুত্রকন্যাকে বক্ষোমধ্যে টানিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতে চেষ্টা করিল।

(৫)

নদীর স্রোতের মত দিন বহিতে লাগিল। সুখেই হউক্, দুঃখেই হউক্, দিন কাটিয়া যাইবেই। সময় কাহারও হাত ধরা নহে। কালিদাসীর মৃত্যুর পর আজ দু'বৎসর চলিয়া গিয়াছে। হরিদাসের শোকের বেগ অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। হরিদাস অনেক কষ্টে মাতৃহারা শিশু দু'টিকে লালনপালন করিতেছে, তাহাকে একাধারে পিতা ও মাতা উভয়ের কর্ত্তব্যই সম্পাদন করিতে হইতেছে। একজন দূরসম্পর্কীয়া বৃদ্ধা বিধবা পিসীকে বাড়ীতে আনাইয়া কোন রকমে সে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। শৈশবে মাতৃবিয়োগের ন্যায় কষ্ট বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই!

অন্নপূর্ণা এখন পাঁচ বৎসরের; তাহার একটু জ্ঞান হইয়াছে। সে ছোট ভাই অনাথকে আদর যত্ন করে, কাঁদিলে তাহাকে ভুলাইয়া রাখে। বাপকে জল দেওয়া বাতাস করা প্রভৃতি ছোট ছোট কাজগুলি সে করিতে শিখিয়াছে। হরিদাস চাকুরী-স্থান হইতে বাড়ী আসিয়া পুত্রকন্যার মুখ দেখিলে অনেকটা প্রফুল্ল হইত। তবু যেন সে পৃথিবীতে একান্ত একাকী, মধ্যে মধ্যে এইরূপ অনুভব করিত। কিসের যেন একটা অভাব, একটা অতৃপ্তি, সর্ব্বদাই তাহার মনের ভিতর দুঃখ জানাইয়া যায়!

কালিদাসীর মৃত্যুর পর অনেকেই হরিদাসকে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছিল। হরিদাস প্রথম প্রথম নূতন বিয়োগজনিত শোকে উন্মত্ত হইয়া এই সব কথায় আদৌ কর্ণপাত করিত না। এখন ক্রমশঃ তাহার মনের জোর শোকের শান্তির সহিত কমিয়া আসিতে লাগিল। একদিন হরিদাস আফিস

হইতে বিষণ্ণবদনে বাড়ী আসিলে তাহার পিসী বলিলেন,—"দেখ্, হরি, আর কতদিন এমন করে কাটাবি বাবা! যা হবার তা হয়ে গেছে; তার অদৃষ্টে সুখ নেই, স্বামীপুত্র নিয়ে কোথা হতে সে সুখ করবে? তোর মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। আমিও বুড়োমানুষ, কদিন বাঁচি ঠিক নেই। তুই একটা দেখে শুনে বড়সড় দেখে বউ কর। আবার নতুন সংসার পাত।" হরিদাস "আচ্ছা দেখি" বলিয়া চলিয়া গেল। পিসীও বুঝিলেন যে এইবার ভাইপোর মন টলিয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে কেবল বিবাহযোগ্যা কেন অরক্ষণীয়া পাত্রীরও অভাব কিছুমাত্র নাই। অল্প অনুসন্ধানেই এক বয়স্থা সেয়ানা পাত্রী নির্ব্বাচিত হইল। পাত্রী দেখিয়া হরিদাসের পছন্দ হইল। সে মনে মনে ভাবিল "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!" আমরা বলি, কালস্য কুটিলা গতি! হরিদাস শুভদিনে বালিকার গলায় বরমাল্য অর্পণ করিয়া পরদিন তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিল। অন্নপূর্ণা অনাথ বাপ বৌ লইয়া বাড়ী আসিতে হাসিমুখে দৌড়িয়া গেল; জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, ও কে?" হরিদাস উত্তর করিল,—"তোদের মা!" এতদিন পরে মাকে পাইয়া অনাথ যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইল। "মা এসেছে, মা এসেছে" বলিয়া সে আনন্দে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল। এ দৃশ্যে বৃদ্ধা পিসীর শুভদিনেও চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তিনি ভাবিলেন, "হায়রে মাতৃহারা অবোধ শিশু!"

(৬)

নববধূ কুমুদিনী অল্পদিনের মধ্যেই কাজকর্ম্ম সব বুঝিয়া লইল। সৎসম্পর্কে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও

সে সমুদয়ের পর পর অভিনয় হইতে লাগিল। কুমুদিনী দিবারাত্র অন্নপূর্ণা ও অনাথকে বকিতেছে, বিনাদোষে তাহাদের প্রহার করিতেছে; হরিদাস প্রথম প্রথম স্ত্রীকে এর জন্য তিরস্কার করিত। কিন্তু ভাগীরথীর খরস্রোতের মুখে তুচ্ছ তৃণখণ্ডের ন্যায় তাহার সকল কথাই ভাসিয়া যাইত। একদিন কুমুদিনী বিনাদোষে অনাথকে বিষম প্রহার করিল। অনাথ হতজ্ঞান হইয়া "মা, মা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কুমুদিনী বলিয়া উঠিল,—"হতভাগা ছেলে, মরতে আর যায়গা পেলে না। যাও না, যেখানে মা গেছে, সেখানে যাও না!"

এ তিরস্কার বৃদ্ধা পিসীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"দেখ বৌ, এই ছেলেদের মানুষ করবার জন্যেই তোমাকে সংসারে আনা হয়েছে। তুমি কেন বাছা ওদের অত মুখঝুক্ করো? ওরা ত আর বাণে ভেসে আসে নে!" কুমুদিনার অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি পড়িল। সে রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল,—"তোমাকে ত কেউ মধ্যস্থ করতে ডাকে নি? আমি ধাই নাকি যে, ছেলে মানুষ করতে এসেছি!" পিসী নিজের মান বজায় রাখিবার জন্য চুপ করিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে হরিদাস পিসীকে বলিল,—"দেখ, পিসীমা, এখন অনেক খরচ বেড়েছে। সামান্য আয়ে সংসার চালান দুষ্কর হয়ে উঠেছে। আর সংসারে লোক ত হয়েছে, তুমি এখন যেতে পার।" পিসী সব বুঝিলেন। মুখে বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে; তাতে আর ক্ষেতি কি?" মনে মনে ভাবিলেন, হায় রে কলিকাল! দোজপক্ষের বে করলে মানুষের কি এতই মতিভ্রম ঘটে। তিনি আর মুখে জল না দিয়াই চলিয়া গেলেন। যাইবার

সময় অনাথ ও অন্নপূর্ণার কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ বড়ই কাঁদিয়া উঠিল। মাতৃহারা শিশু দু'টিকে তিনি যে মায়ের মত মানুষ করিয়াছিলেন! অথচ আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে এই রাক্ষসীর হাতে রাখিয়াই তাঁহাকে যাইতে হইল। তাহারাও তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল স্নেহশীলা দিদিমাকে হারাইয়া আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। কুমুদিনী তাহাদিগকে ধমকাইয়া বলিল,—"আঃ! একটা পাপ বিদায় হলো, বাঁচলুম! অত সোহাগ ত, দিদিমার সঙ্গে যেতে পারলে না?"

(৭)

অনাথ সাত বৎসর বয়সে পাঠশালায় ভর্তি হইল। অন্নপূর্ণার বয়স তখন দশ বৎসর। পাঠশালার কোনও দুষ্ট সহপাঠী "দুয়ো একজনের মা নেইক" বলিয়া অনাথকে রাগাইলে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিয়া হরিদাসের নিকট অভিযোগ করিত। হরিদাস কুমুদিনীকে দেখাইয়া বলিত, "এই যে তোর মা!" কিন্তু অনাথ এ রহস্য ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

একদিন রাত্রে বিমাতার নিকট মার খাইয়া সে অন্নপূর্ণার কোলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এখন দিদিই তাহার সব, আদরে ভগিনী, স্নেহে মাতা, ভালবাসিতে পিতা। কারণ হরিদাস আর ছেলে মেয়েকে তেমন আদর যত্ন করে না। অন্নপূর্ণা বাপের এই পরিবর্তন অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে; কিন্তু কেন যে তাহাদের স্নেহশীল পিতা হঠাৎ এমন নির্দ্দয় হইয়া গেল, তাহা সে সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। অনাথ দিদির গলা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, মা আমাকে এত মারে কেন? আমাদের

পাঠশালার গোপালের মা গোপালকে কত ভালবাসে আদর করে; কই আমাদের মা ত আমাদের ভালবাসে না!"

পবিত্র মাতৃনামে পাছে কলঙ্ক পড়ে এই ভয়ে অন্নপূর্ণা আজ তাহাকে সব বুঝাইয়া দিল, তাহারা মাতৃহারা। ভাইকে বক্ষোমধ্যে টানিয়া লইয়া মধুর বচনে সে বুঝাইয়া দিল কুমুদিনী তাহাদের আসল মা নহে; তাহাদের মা ঐ নীল আকাশে নক্ষত্ররাজির মধ্যে বাস করিতেছেন, তিনি এ পৃথিবীতে আর আসিবেন না।

অনাথ স্বর্গীয়া মাতার কথা ভাবিতে ভাবিতে দিদির কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। অনাথ নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিল যেন এক জ্যোতির্ম্ময়ী রমণীমূর্ত্তি মেঘের ভিতর হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছে। অনাথ সেই দেবীমূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমাদের মা? আমাদের কাছে থাকো, আর ছেড়ে যেয়ো না। আমাদের বড় কষ্ট হয়!" রমণীর গণ্ডস্থল দিয়া দরদর ধারে অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

অনাথ কাঁদিয়া উঠিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে দেখিল যে, অন্নপূর্ণা তাহার পাশে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। অন্নপূর্ণা বলিল,—"ভয় কি? ঘুমোও। এই যে আমি পাশে বসে আছি।" অনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দিদি, এই মা এসেছিলো!"

(৮)

অন্নপূর্ণা দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার কৈশোর-সুলভ চপলতা ও কমনীয়তা তাহার সৌন্দর্য্যের আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহাকে যেই দেখে, সেই তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য, সরলতা ও ভাবের মাধুর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া যায়। কিন্তু তাহাকে বড় হইতে দেখিয়া হরিদাসের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কি রকমে কন্যা পার করিবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। অর্থবল নাই, সমাজে মানসম্ভ্রম নাই; কন্যার বিবাহ দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কুমুদিনী স্বামাকে উপদেশ দিল,—"একটা দোজবরে বয়স হয়েছে এমন দেখে ধরে দাও; পয়সা কড়ি কিছু লাগবে না।" কিন্তু যার অদৃষ্টে সুখ লেখা আছে, কে তাহা খণ্ডন করিবে?

বিলাসপুর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমিদার হরিধন বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র সম্প্রতি বি, এ, পাশ করিয়া ওকালতি পড়িতেছে। যুবক বিদ্বান, বিনয়ী ও সচ্চরিত্র। সে একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে বিলাসপুরে আসিয়া অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া গিয়াছিল এবং পরে তাহার বিষয় সবিশেষ খোঁজ লইয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ পিতার অনুমতি ক্রমে এককড়া কাড়ও যৌতুক না লইয়া অন্নপূর্ণাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেল। বিবাহে আধ পয়সাও খরচ হইল না বটে, কিন্তু অন্নপূর্ণার সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়া, হিংসায় কুমুদিনীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা স্বামীগৃহে যাওয়া অবধি তাহাদের সংসারে লক্ষ্মীশ্রী উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বয়ং অন্নপূর্ণা যে ঘরে বাঁধা, সেখানে আবার

দুঃখ কোথায় ? শ্বশুরালয়ে অন্নপূর্ণার সুখের সীমা নাই। এমন গুণবান স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতির যথাযোগ্য আদর, স্নেহ ও যত্ন ভোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অন্নপূর্ণাও তাহাদের সকলকে সেবায় যত্নে মিষ্ট কথায় বাধ্য করিয়া ফেলিল। কিন্তু এত সুখেও সে আড়ালে অসহায় অনাথের কষ্ট স্মরণ করিয়া কাঁদিত। কিন্তু কি করিবে, তাহার কোন হাত নাই। সে দীনবন্ধু ভগবানের হাতে অনাথকে সমর্পণ করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইল।

বিবাহের একমাস পর হইতেই অন্নপূর্ণা শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে। হরিদাসও কন্যার খোঁজ-খবর লওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে বলিলেও হয়। অনাথ মধ্যে মধ্যে দু' একদিন দিদির শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকে। তখন ভ্রাতা-ভগিনীর আনন্দের সীমা থাকে না। উভয়েরই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইতে থাকে। মিলনের সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও দয়ায় গলিয়া যায়।

কুমুদিনী একদিন স্বামীকে বুঝাইয়া দিল যে, অনাথ আদৌ লেখাপড়া করে না, দিনরাত্রি খেলিয়া বেড়ায়। তাহার পড়াশুনা আর হইবে না। পাঠশালায় তাহার মাহিনা দেওয়া আর গঙ্গার জলে পয়সা ফেলিয়া দেওয়া দুইই সমান। পরদিন হইতে অনাথের পাঠশালা যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। অনাথ এই সংবাদ যথাকালে দিদিকে জ্ঞাত করিল। অন্নপূর্ণা লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া শাশুড়ী ও স্বামীকে এই কথা জানাইয়া ইহার একটা বন্দোবস্ত করিতে তাঁহাদের অনুরোধ করিল। নচেৎ বাল্যেই লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য হইয়া ভাই ভবিষ্যতে গোমূর্খ হইবে, ইহা

জানিয়াও অন্নপূর্ণা কি প্রকারে চুপ করিয়া থাকিবে? তাহার শাশুড়ী শুনিবামাত্র স্বামীপুত্রের সহিত যুক্তি করিয়া অনাথকে তাঁহাদের বাটীতে আনাইয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

(৯)

কুমুদিনী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আজ তাহার সুখের পথ নিষ্কণ্টক হইল। কুমুদিনী রাত্রে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে হাসিমুখে পতিপাশে আগমন করিল। হরিদাস যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইল। তাহাকে এত সুন্দরী সে পূর্ব্বে কোনও দিন দেখে নাই। এমন প্রস্ফুট কমলের ন্যায় বদনমণ্ডল, মৃণাল-কোমল ভুজবল্লরী, কুরঙ্গলাঞ্ছিত নয়নযুগল,—হরিদাস স্বর্গে কি মর্ত্তো ঠিক করিতে পারিল না। কুমুদিনী মনে মনে এক মতলব আঁটিয়া আসিয়াছিল। মায়াবিনী বুঝিল, ইহাই যোগ্য অবসর; এমন সুবিধা আর হইবে না। পতিকে কতই সোহাগ জানাইয়া কাঁদ কাঁদ মুখে সে বলিল,—"দেখ, তোমার ছেলে মেয়ে এই বয়স হতেই আমাকে দেখতে পারে না। আমি তাদের এত যত্ন করি, তবু তারা আমাকে সৎমার মতই দেখে। আমি যেন তাদের চক্ষুঃশূল। তার উপর অনাথ যেমন গোঁয়ার গোবিন্দ তৈরী হচ্ছে, তাতে সে যে বড় হয়ে আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে, তাতে আর সন্দেহ কি? তুমি বর্ত্তমানেই তোমার অসাক্ষাতে এক কথা বল্লে, সে আমাকে তেড়ে মারতে আসে; তুমি অবর্ত্তমানে ধরে মারবে। আমার বরাতে এত দুঃখও ছিল!" বলিতে বলিতে মায়াবিনীর মুখমণ্ডল শ্রাবণের বারিবর্ষণোন্মুখ জলদমালার ন্যায় গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষুদু'টি ছল ছল করিতে লাগিল।

হরিদাস প্রমাদ গণিল। বলিল,—"বল, আমাকে কি করতে হবে? তোমার সুখের জন্যে আমি সব করতে পারি।" এই বলিয়া সে পত্নীকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল। কুমুদিনী বুঝিল যে, হাঁ ঔষধ এবার ধরিয়াছে। সে সহাস্যবদনে বলিল,—"আহা, এই না হলে স্বামী! সত্যি, আজ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, তুমি যথার্থই আমাকে ভালবাস। তা বলে আমার মত প্রাণভরে ভালবাসতে কিছুতেই পারবে না।" হরিদাসের কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ হইতেছিল। সে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"পুরুষ যদি স্ত্রীলোকের ন্যায় ভালবাসতে পারতো, তাহলে পৃথিবী কত সুখের স্থান হতো!"

কুমুদিনী এবার শুভলগ্ন উপস্থিত দেখিয়া কাজের কথা পাড়িল। "দেখ, মানুষের দেহের কথা কিছুই ঠিক বলতে পারা যায় না। আজ যাকে দেখতে পাচ্ছি, কাল আর সে নেই। অনাথকে হাতে রাখবার জন্যে এই বাড়ীখানি ও তোমার জমি-জরাত যা কিছু আছে, আমার নামে লিখে দাও। আমার ত আর ছেলেপুলে হল না, ওরা বেঁচে থাক্, আর ছেলের দরকারই বা কি! বুঝতে পারছো ত? তবে আমার নামে ঘরবাড়ী থাকলে অনাথ আমাকে মেনে চলবে। পরে সেই ত সব ভোগ করবে!" হৃতচৈতন্য হরিদাস বুঝিল এ ত বেশ যুক্তিসঙ্গত কথা। সে স্ত্রীর বুদ্ধির খুবই প্রশংসা করিল। কুমুদিনী মনে মনে ভাবিল,—"তোমার মত পুরুষের চোখে ধূলো দিতে যদি না পারলুম, তবে স্ত্রীলোক হয়ে জন্মেছিলুম কেন?"

হরিদাস পরদিনই উইল প্রস্তুত করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। কুমুদিনী তখন বলিল,—"চল, ছাদে যাই, ঘরে বড় গরম।" সে দিন

পূর্ণিমা তিথি। আকাশে পূর্ণিমার শুক্লশশী হাসিতেছে ; বাগানের কুসুমনিচয় হাসিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতি যেন হাসিতেছে বলিয়া বোধ হইল।

হরিদাস ও কুমুদিনী ছাদের উপর বসিল। চন্দ্রালোকে স্নাত হইয়া কুমুদিনীর বদনমণ্ডল ফুটন্ত শ্বেত গোলাপের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। হরিদাস আবেগে পত্নীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিল,—"কুমুদ, তোমাকে বড়ই ভালবাসি, সমস্ত প্রাণভরে ভালবাসি। এত আমি আর কাকেও কখনও ভালবাসি নি!" হঠাৎ যেন ছাদের এক কোণে কে খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহারা উভয়েই ভয় পাইল। তাহাদের মনে হইল যেন সেখানে একজন ক্ষীণকায়া স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অট্টহাস্যময়ী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! বায়ুকলতানে কে যেন বলিয়া উঠিল, "মানুষ একবারই ভালবাসে!" আম্রবৃক্ষের শাখায় বসিয়া কোকিল বধূ যেন তান ধরিল,—"জীবনে বারেক আসে প্রেমের স্বপন!"

হরিদাস যেন এক নবজীবন লাভ করিল। তাহার চক্ষু হইতে সংসারের মোহ আবরণ সরিয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কালিদাসী, তুমি এসেছ। সব বুঝতে পেরেছি ; আর বলতে হবে না। আজ আমার মোহনিদ্রা ভেঙ্গে গেছে।" বলিতে বলিতে হরিদাস উন্মাদের ন্যায় ছাদ হইতে নামিতে লাগিল। কুমুদিনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহার পিছু পিছু চলিল। সে হরিদাসকে "কর কি?" "কর কি?" বলিতেই, হরিদাস তাহাকে "দূর হও, শয়তানী" বলিয়া অনাথকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিতে সেই রাত্রেই চলিয়া গেল।

পনরই বৈশাখ

(১)

প্রজারঞ্জক আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বের সময়ই বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। বর্গীরা প্রজাগণের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত, শস্যপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র সকল উৎখাত করিত, প্রজাগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের গৃহে আগুন জ্বালাইয়া দিত। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার এক সেনাপতির উপর সকল ভার অর্পণ করেন।

বৈশাখের মধ্যভাগ। সেনাপতি আহারান্তে তাঁহার তাঁবুর ভিতর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় দুই জন অধীনস্থ সৈনিক এক প্রাণদণ্ড-আজ্ঞাপত্রে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হইল।

"এটা কিসের কাগজ?" তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রাণদণ্ড আজ্ঞাপত্র। একজন সৈনিক প্রাতে ইহাকে পাহাড়ের উপর ধরে।"

"লোকটা কোথায় যাচ্ছিলো?"

"বলে তার ভাইকে দেখবার জন্যে আসছিল; কিন্তু সে সব মিছে কথা। লোকটা পাকা বদমায়েস। আমাদের দলের দু'চার জন বলে ওকে চেনে। বধ করা হবে ত?"

"আচ্ছা, এই নাও।"

তিনি আজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হুকুমটা

বিশেষ বিচার না করিয়াই তাড়াতাড়ি দেওয়া হইল; কাজটা ভাল হইল না। লোকটা হয় ত নিদ্দোষও হইতে পারে। তাঁহার মনে একটু অনুতাপের উদয় হইল। তিনি আদেশ রোধ করিবার জন্য দ্রুতপদে বহির্গত হইলেন, কিন্তু বধ্যভূমিতে যাইয়া দেখিলেন, হতভাগ্যের জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। বেচারীর রক্তাক্ত কলেবর ভূমির উপর শায়িত। লোকটী যুবক ও দেখিতে সুশ্রী। কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া তিনি মনে মনে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

বিশ্বনাথকে বধ করিবার সময় অনেক দর্শক বধ্যভূমিতে সমবেত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে তাহার ভাইও তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিল। হত্যাকার্য্য শেষ হইয়া গেলে, সে তাহার বিধবা বৌদিদির নিকট গিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানান্তর গম্ভীর ভাবে বলিল,—"এর প্রতিহিংসা না নিয়ে জল গ্রহণ করবো না।" তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

এমন সময় কে একজন দরজায় ধাক্কা মারিল।

বড় ছেলে দরজা খুলিয়া দেখে তাহাদেরই এক প্রতিবেশী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। ইনি পাড়াপ্রতিবেশীর হিতকর কার্য্যে তৎপর ছিলেন; সেইজন্য পাড়ার লোকেরা ইহাকে বাবাঠাকুর বলিয়া ডাকিত ও ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

"বাবাঠাকুর এসেছেন।"

তিনি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিলেন বিশ্বনাথের ভাই একটি বহুদিনের অব্যবহৃত মরিচাপড়া তরবারি বাহির করিয়া পরিষ্কার করিতে বসিয়াছে। মৃতের দুটি বালকপুত্রও তাহাকে সাধ্যমত এ

কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। হতভাগিনী বিধবা শুষ্ক নেত্রে তাহাদের সম্মুখে বসিয়া এ সব নিরীক্ষণ করিতেছিল।

"তুমি তা'হলে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে বন্দোবস্ত করছো?" বিশ্বনাথের ভায়ের দিকে তাকাইয়া কঠোর স্বরে বাবাঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন।

অস্ত্রটি পরিষ্কার করিতে করিতেই সে উত্তর দিল, "তারা বিনা দোষে কাপুরুষের মত আমার ভাইকে হত্যা করেছে!"

"প্রতিহিংসার চিন্তা মন থেকে একেবারে দূর করে দাও। ঈশ্বরের তা অভিপ্রেত নয়। দোষীকে শাস্তি দিবার ভার তাঁর উপর। পৃথিবীতে যারা অন্যায় কার্য্য সমাধা করে, এ জন্মে অবিরাম অনুতাপানলে তারা দগ্ধ হবে, ও পরজন্মে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে।"

তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয় তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। সে মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপদেশের বিরুদ্ধে দু'চারটা কথা বলিলেও, মোটের উপর অনেকটা সুফলই ফলিল। সে অস্ত্রটি সরাইয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"অনেক ভেবে দেখলুম, আপনি যা বলছেন, তাই ঠিক। আমার হয়ে তারই বিবেকদংশন এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে। আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, তার রক্তপাত করবার জন্যে কখনও তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না।"

(২)

সেদিন সন্ধ্যার সময় সেনাপতি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার এক পার্শ্বরক্ষক

অনুচর দ্রুতপদে তাঁহার শিবিরের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার মুখ কাগজের ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘন ঘন কাঁপিতেছে। সে সেনাপতির হাতে একখানি গালাআঁটা পত্র দিল। পত্রে লেখা ছিল,—

"১১৪৮ সন ১৫ই বৈশাখ বিশ্বনাথ মরিয়াছে। সেনাপতি ১১৪৯ সন ১৫ই বৈশাখ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর ঠিক বার মাস।"

চিঠির তলদেশে পত্রলেখকের নামস্বাক্ষর পড়িবার যো নাই।

"এ চিঠি কে নিয়ে এলো?"

অনুচর ভীতিবিহ্বল স্বরে উত্তর করিল,—"বিশ্বনাথ।"

"বিশ্বনাথ! সে ত মারা গেছে! তুই পাগল হয়েছিস্?"

"আমি স্বচক্ষে তার হত্যা দেখেছি। মৃতদেহ যখন শ্মশানে আনা হয়, তখনও আমি উপস্থিত ছিলুম। আমি মিথ্যে কথা বলবো না।"

সেনাপতির বীরহৃদয় এ সব কুসংস্কার বলিয়া তুচ্ছজ্ঞান করিল বটে, কিন্তু এই অদ্ভুত পত্র পাঠে তাঁহার মন বড়ই অশান্ত হইয়া উঠিল। যাহোক্ তিনি ভাবিলেন দিনকতক বাদে এ ঘটনার কিছুই তাহার মনে থাকিবে না। আর বাস্তবিকই পাঁচ দিন পরে তিনি ইহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন।

পরবর্ত্তী মাসের চৌদ্দ তারিখে সেনাপতি দু'চার দিনের জন্য কাহাকে কিছু না বলিয়া বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বাড়ী আসিলেন। পরদিন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিয়া বলিল, একজন রোগা লম্বা লোক এখানি সেনাপতিকে দিবার জন্য তাহাকে

দিয়া গেল। এ চিঠিখানির বাহ্যাকৃতি ও ভিতরের লিখিত বিষয় সর্ব্বাংশেই প্রথমখানির অনুরূপ; কেবল মাসের সংখ্যা বারো হইতে এগারতে পরিণত হইয়াছে। ইহা পড়িয়াই সেনাপতির মনে সেই অতীত আশঙ্কার ছায়া আবার নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিল। কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপও আবার ভূতের ন্যায় তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। ভারগ্রস্ত বিবেকবাণী যেন তাঁহাকে স্থির বলিয়া দিল যে, এই রহস্যের সহিত নিশ্চয়ই অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক কিছু ব্যাপার জড়িত আছে। তিনি যে এখানে আসিবেন, সে অভিপ্রায় ত তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, রাজদরবারে অবকাশের প্রার্থনা না করিয়াই গোপনে গত রাত্রে এখানে পৌঁছিয়াছেন। সাধারণ মানুষে কি শক্তির বলে তাঁহার এই অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া এ প্রকারে তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইবে? একটা উদ্বেগ ও অশান্তির ছায়া তাঁহার মনের মধ্যে ঘনাইয়া আসিল। তাঁহার আহার নিদ্রা একেবারে দূর হইল। এ চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় তিনি নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হইলেন, কিন্তু কিছুতেই নিস্তার পাইলেন না। মানসিক যন্ত্রণায় তাঁহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল।

পনর তারিখ আষাঢ় তিনি এক বন্ধুর বাড়ী প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান। সমবেত বন্ধুবান্ধবের সহিত কথোপ-কথনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় চাকর আসিয়া তাঁহার হাতে গালা দিয়া আঁটা একখানি পত্র দিল। পরক্ষণেই তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বাক্‌শক্তি

যেন তাঁহার একেবারে লোপ পাইল। পরে অসুখের ভাণ করিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

তাহার পর হইতেই শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন প্রকার ক্রীড়া-কৌতুকে তিনি আর যোগদান করিতে পারিলেন না। সুখভোগ এখন তাঁহার নিকট সুদূর অতীতের স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে দিন আর ফিরিবে না। কেবল ক্ষণস্থায়ী একটা সান্ত্বনা, ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়াই আবার অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতি লইয়া তীরে ভাসিয়া উঠা! তিনি শারীরিক পরিশ্রমে ও রাজকার্য্যে দিন রাত নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া স্মৃতিপিশাচীর দংশন যন্ত্রণা এড়াইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চিত্তফলক হইতে অপসৃত হইল না। তীক্ষ্ণধার শরের ন্যায় সেটা সেখানে বিঁধিয়া রহিল। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে নিহত যুবকের সেই রক্তাক্ত দেহ ভূমিশায়িত দেখিতেন এবং তাঁহাব চঞ্চল দৃষ্টিও সর্ব্বদাই যেন তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত।

(৩)

শ্রাবণ মাস ও পরবর্ত্তী মাসগুলি এই প্রকারেই কাটিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্নে পাহাড়ে বহুক্ষণ বেড়াইয়া ক্লান্তচরণে বাড়ী ফিরিবার সময় তিনি এক ক্ষুদ্র তটিনীর তীরবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া আসিতেছেন, পথের মোড়ে পাহাড়ের তলদেশে দণ্ডায়মান এক লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। লোকটা হঠাৎ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি অগ্রসর হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। অকস্মাৎ

তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তিনি এত বিস্মিত হইতেন না। একি, এ যে বিশ্বনাথ! তাঁহার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল; তাঁহার ডান হাত অলক্ষিতে কোষ হইতে তরবারি মুক্ত করিল। তিনি তদ্দ্বারা লোকটাকে সজোরে আঘাত করিলেন। সে ছায়াকৃতির ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসি খেলিয়া গেল। নিশ্চলভাবে সেখানে কিছুক্ষণ দাড়াইয়া যেন যাদুমন্ত্রের দ্বারা সে অদৃশ্য হইল। সেনাপতি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া দেখিলেন, লোকটা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে লেখা, আর মাত্র ছয়মাস এ পৃথিবীর আলোক বাতাস ভোগ তাঁহাব অদৃষ্টে ঘটিবে!

এ ঘটনার পর সেনাপতির মনে আর বিন্দুবিসর্গও সন্দেহ রহিল না যে, এই অদ্ভুত রহস্যের ভিতর নিশ্চয়ই কিছু অস্বাভাবিক আছে। তাঁহার ভয় ও মানসিক যন্ত্রণা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। পরবর্ত্তী মাসে যে দিন নূতন পত্র পাইবার কথা, সে দিন প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তিনি একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু সে দিন দিনের বেলা কিছুই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল না। সন্ধ্যা আগত হইতেই তিনি ভাবিলেন এবার বোধ হয় যাদুমন্ত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি আনন্দের সহিত বেড়াইতে বাহির হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক নির্জ্জন প্রান্তরমধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র সেতু উত্তীর্ণ হইতেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ লোক আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই সেনাপতি চিনিতে পারিলেন যে, এই বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্প্রতি দস্যু বলিয়া ধৃত ও রাজদরবারে তাহার দোষও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার

সৈন্যদল ইহার বাড়ী ঘেরোয়া করিয়া সর্ব্বস্ব লুটপাট্ করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া আসিয়াছে। সমূহ বিপদপাতে বৃদ্ধের মাথা বোধ হয় বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিংবা তাঁহার নিকট সে কোনরূপ সাহায্যপ্রার্থী। তিনি আর তাহার সহিত অসৎ ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ধীরভাবে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ এক পাও না সরিয়া তাঁহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল,—"আমি আপনার জন্যেই এতক্ষণ পথে অপেক্ষা করছিলুম।"

"তুমি আমার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলে? কেন? যারা রাজ-বিদ্রোহী, দস্যু, তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র দয়ামায়া নেই।"

"আপনার ধারণা ভুল। তবে শুনুন,—"

এ অপমানে সেনাপতির মুখ লাল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"আমাকে বিনা শাস্তিতে কেউ কখন সামান্য অপমানও করে যায় না। অস্ত্র ধর; আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হও।"

"কিসের জন্যে? সংসারে আমার যা কিছু বন্ধন ছিল, সব জোর করে তুমি ছিন্ন করে দিয়েছ। সেই অবধি এ দুঃখময় জীবন আমার কাছে মস্ত বড় একটা ভার বলে মনে হয়। শুধু আত্মরক্ষা কেন, ইচ্ছা করলে এর উপযুক্ত প্রতিশোধও নিতে পারতুম। ধর্ম্মের বল আমার দিকেই, ধর্ম্মযুদ্ধে অসি ধরতে পাপীর হাতই সর্ব্বদাই কাঁপে।"

"কই, আমার হাত কি কাঁপছে?" সেনাপতি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ ঘৃণাসহকারে ঈষৎ হাসিল। পরে পকেট হইতে এক

টুকরা কাগজ বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া কৃত্রিম ধীরভাবে বলিল,—"আমার কাজ ফুরুলো, এর জন্মেই আমার আসা। ওকি, তোমার হাত কাঁপে কেন?"

সেনাপতি পত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, পত্রলেখক কে। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন. বৃদ্ধ অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু অদূরেই বিশ্বনাথের গম্ভীর মূর্ত্তি তাঁহার দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে!

(৪)

এই ভীষণ নির্য্যাতনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সেনাপতি অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। সে সব অনেক কথা। তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। তিনি কিছুতেই মনের শান্তি পাইতেন না। শান্তির অন্বেষণে কাজকর্ম্মে অবসর লইয়া নানা জনহীন প্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যাহাতে এ সাঙ্ঘাতিক পত্র আর তাঁহার নিকট না পৌঁছাতে পারে। কিন্তু বাসস্থান গোপন রাখিবার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিমাসের ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে পত্র তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল।

শেষে বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিয়া সুদূর সিংহল দ্বীপে তাঁহার এক ভগিনীর শ্বশুরালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে তিনি মনস্থ করিলেন। বিদেশী বণিকদের জাহাজে চড়িয়া বাঙ্গালার শেষ সীমা অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার মনে হইল যেন হৃদয় হইতে মস্ত একটা গুরুভার নামিয়া গেল। কিন্তু মধ্যরাত্রে পথে সমুদ্রবক্ষ স্ফীত

করিয়া প্রবল ঝড় উঠিল। জাহাজ টলমল করিতে লাগিল। সেনাপতি জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া নাবিকদের কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে বিশ্বনাথকে তাহাদের মধ্যে দেখিয়া আতঙ্কে তাঁহার দেহের রক্ত জল হইয়া গেল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় জাহাজের কামরায় যাইবার পথে কে একজন তাঁহার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল এবং কাল গালা আঁটা একখানি পত্র ঠস্ করিয়া তাঁহার পদতলে ফেলিয়া দিল। ইহাতে এ হতভাগ্য পলাতকের মন যে গভীর নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়িল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইল এবং উদ্ধার লাভের এই শেষ ক্ষীণ আশাটুকুও একেবারে নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

তিনি যথাসময়ে ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু তাঁহার চেহারার এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে তাঁহাকে চিনিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইল। তাঁহার চিন্তা-জীর্ণ দেহ মৃত্যুবিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বেকার সে সদাপ্রফুল্ল ভাবের পরিবর্ত্তে বদনে যেন বিষাদের কালিমা সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি বড়ই চঞ্চলমতি ও অল্পভাষী হইয়া উঠিয়াছেন এবং যৌবনেই অকালবার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। এ সব অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া তাহারা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইত না।

একদিন অপরাহ্নে মল্লক্রীড়া দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় পথে

তাঁহার ভগিনী তাঁহার এই সদা বিমর্ষ ভাবের কারণ জানিবার জন্য বড়ই জিদ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তাঁহার কথা শুনিলেন। ভ্রাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া নারীসুলভ কোমল কণ্ঠে তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—"কেন বৃথা এত কষ্ট পাচ্ছ? তোমার মুখ দেখলে আমার প্রাণ ফেটে যায় যে! যদি কোনও কৃতকর্ম্মের অনুতাপানল দিনরাত মনের মধ্যে জ্বলতে থাকে, তাহলে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত কর; মনে বিমল শান্তি পাবে। কি হয়েছে, আমার কাছে বল, লক্ষ্মী ভাইটি আমার!"

মূর্ত্তিমতী করুণার শীতল করস্পর্শে তাঁহার বুক হইতে যেন একটা পাষাণের চাপ সরিয়া গেল। তিনি হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"হায়, আমার মত আর হতভাগা পৃথিবীতে কে আছে? ঈশ্বরের কাছেও যে অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করে প্রার্থনা করবো, সে সান্ত্বনা লাভ হতেও আজ আমি বঞ্চিত। অথচ আজ সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষীণ জীবন-প্রদীপও চির অন্ধকারে নিভে যাবে। এ শস্যশ্যামলা ধরিত্রী হতে, তোমার কাছ থেকে, আমাকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হবে। দেখ, দেখ ঐ যে—" বলিতে বলিতে তাঁহার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। রাস্তার অপর ধারে মৃদুমন্থর গতিতে চলিতেছে, একটি লম্বা লোকের দিকে তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন।

সেনাপতিকে কোনও রকমে কোলে করিয়া বাড়ীতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইল। তিনি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে পথটুকু হাঁটিয়া যাইতে পারিলেন না।

তাঁহার ভগিনীর বিশ্বাস হইল যে, এ অদ্ভুত রোগের উৎপত্তিস্থল ভ্রাতার বিকৃত মস্তিষ্ক। সেনাপতিকে একটি ঘরের ভিতর বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া তাঁহারা ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে সন্ধ্যা হইবার অনেক পূর্ব্বেই ঘরে প্রদীপ জ্বালিলেন। সেনাপতি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া বিছানার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল, কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে চলিল অথচ বিশেষ কিছুই ঘটিল না দেখিয়া তিনি নিজেকে অনেকটা সুস্থ বিবেচনা করিলেন। সাহসে ভর দিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া এতদিন যে বৃথা কল্পনায় প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা লইয়া তিনি তাহাদের সহিত প্রফুল্লচিত্তে ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। এমন সময় নীচের সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। হঠাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া কে একজন রোগীর শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। সেনাপতি সেই অপরিচিত ব্যক্তির দিকে তাকাইবা মাত্র তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গিয়াছে! তখন সেই সবেমাত্র দিনের আলো নিভিয়া আসিয়াছে, সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন।

এ ব্যক্তি বিশ্বনাথের ভ্রাতা।

সেনাপতির ভগিনীপতি সক্রোধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি দরকার?"

"আজ্ঞে সেনাপতি মশাই যে জাহাজে এখানে এসেছেন, আমি সে জাহাজের একজন নাবিক। আমাদের জাহাজ আবার কাল দেশে ফিরে যাবে। তাই খবর দিতে এলুম, যদি ওঁর দেশে কাকেও কিছু সংবাদ দেবার থাকে।"

দাদা

(১)

গ্রামের সকলেই তাহাকে আদর করিয়া পাগল বলিত। কেহ তাহার আসল পরিচয় জানিত না। গ্রামেরই ধারে একটি জীর্ণ শিবমন্দিরের ভিতর সে কিছুকাল ধরিয়া বাস করিতেছে। সবাই জানিত, সংসারে তাহার আপনার বলিবার কেহই নাই।

তাহার তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল গৌর বর্ণ তৈল ও স্নানাভাবে মলিন হইয়া গিয়াছে। কুঞ্চিত কেশরাশি রুক্ষ ও জটাজুটবদ্ধ। তাহার সুশ্রী বদনমণ্ডলে যেন বিষাদের কালিমা মাখান রহিয়াছে। কেহ যদি তাহাকে বলিত, "আচ্ছা, তুমি এত সুপুরুষ, তোমার এমন সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আর দেহের প্রতি নজর রাখ না? নিয়মমত স্নান-আহারাদির দ্বারা শরীরের বিশেষ যত্ন কর।" সে কথার সে বড় একটা উত্তর দিত না, উদাসভাবে বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। কখনও বা এ সব কথা শুনিয়া সে নিজ মনে গান ধরিত,—

মিছে রূপের গুমর কর, ওরে আমার মন,
দেহ বড় পরিপাটী,— নয়ন মুদ্‌লে হবে মাটি,
মাটির দেহ হবে মাটি, মাটিতে পতন।
কোথায় রবে গাড়ী ঘোড়া, শাল দোসালা টাকার তোড়া,
মরলে দেবে খালি গোবর ছড়া, কাঁদবে পরিজন।

কাহারও সহিত সে বড় একটা মিশিত না, অথচ গ্রামবাসীর আপদে বিপদে বিপন্নকে যথাসাধ্য সাহায্য করিত। এই জন্য সবাই তাহাকে ভালবাসিত। কিন্তু সে যে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহার বংশপরিচয় আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহার নিকট হইতে জানিতে পারে নাই। সে বিষয়ে কেহ কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, পাগল সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া অন্য কথা তুলিত। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়-পিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইত।

ঝড় জল বৃষ্টি কিছুকেই সে গ্রাহ্য করিত না। গভীর রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের মধ্যে মৃত ব্যক্তির শ্মশানে সৎকার করিতে সেই প্রথম অগ্রসর হয়। এ প্রকার নানা লোকহিতকর কার্য্যে তাহাকে ব্যাপৃত দেখিয়া সবাই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, পরের হিতার্থে নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা এমন কি প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত সে ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। কিন্তু এত অল্প বয়সে সংসারের প্রতি তাহার এরূপ কঠোর বৈরাগ্যের কারণ কেহই স্পষ্ট নির্দ্ধারণ করিতে পারিত না। তাহার কণ্ঠস্বর বড় সুমিষ্ট ছিল। মধ্যে মধ্যে সে এমন সুন্দর শ্যামাবিষয়ক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিত যে, শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া তাহার মধুরোজ্জ্বল বদনমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া থাকিত, আর গভীর সমবেদনায় অশ্রুধারা বর্ষণ করিত। কখনও অমাবস্যার রাত্রে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্য দিয়া গান গাহিতে গাহিতে সে গ্রাম্যপথ ধরিয়া যাইত,—

আঁধারেতে ভয় করি না,
আঁধার আমি বাসি ভাল,

আঁধার দেখলে মনে পড়ে,
শ্যামা মা মোর এমনি কাল।
ভয়ের আকার দেখলে পরে
ডাকি আমার শ্যামা মা রে,
ছায়া পথে দেখতে পাই
সে মায়ের রাঙা পায়ের আলো।

তাহার গলার স্বর শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিত পাগল নিজের মনে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। আর এমন সচ্চরিত্র সদ্‌গুণসম্পন্ন যুবকের এরূপ করুণ অবস্থা দেখিয়া আন্তরিক সহানুভূতিতে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত।

(২)

গত বৎসর পূজার সময় দেশে গিয়া এই পাগলের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়ের দিনই আমি বেশ বুঝিতে পারি যে, এই তথা কথিত পাগলের হৃদয় নিশ্চয়ই অতীতের কোনও গভীর রহস্য বহন করিয়া আসিতেছে। এ ত যথার্থই পাগল নয়! ইহার যে বুদ্ধি ও জ্ঞান টনটনে রহিয়াছে। ইহার অন্তঃকরণের মধ্যে নিশ্চয়ই অতীতের কোন জ্বালাময়ী স্মৃতির অনল দিবানিশি দাউ দাউ জ্বলিতেছে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া এমন কোন দারুণ আঘাত সে পাইয়াছে, যাহাতে এ কোমল বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া এই বিশ্বসংসারে নরনারায়ণের সেবায় মনের শান্তির অন্বেষণে সে ঘুরিতেছে।

সে দিন সপ্তমী। গ্রামের প্রত্যেক অণুপরমাণু যেন মায়ের অপার স্নেহের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। পূজাবাড়ীতে আনন্দের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। গ্রামের বৃদ্ধ, যুবক, বালক সকলেই সেখানে সমবেত। অপরাহ্ণে একাকীই সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলাম। আবাল্য কতদিন নির্নিমেষ নয়নে গ্রাম্য প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়াই দামোদর কুলু কুলু তানে বহিয়া গিয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই নদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন দিনের আলো প্রায় নিভিয়া আসিতেছে। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর চক্রবালের পশ্চিম রেখাকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া বিশ্রামের নিমিত্ত অস্তাচলচূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। কৃষকেরা মাঠ হইতে গাভীর দল লইয়া মনের সুখে গান গাহিতে গাহিতে শ্রান্তচরণে বাড়ী ফিরিতেছে। পাটনী সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া দিনের খেয়া শেষ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তীরস্থ দেবমন্দিরে পূজারি ব্রাহ্মণ আরতির উপকরণসমূহের বন্দোবস্ত করিতেছেন। আমি তন্ময় হইয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখিতেছি, হঠাৎ সান্ধ্যসমীরণে কাহার সুমধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিয়া "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পাশল গো"। একটু মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলাম, এই কণ্ঠস্বর যে আমাদের বিশেষ পরিচিত, এ নিশ্চয়ই সেই পাগলের গলা!

সম্মুখে আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, আমার অনুমান সত্যই হইয়াছে। নদে ভাটা পড়িয়াছে। তীরের উপর একখানি নৌকায় বসিয়া পাগল গলা ছাড়িয়া গান

গাহিতেছে। আহা কি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর! কাল ও পাত্রভেদে তাহা যেন আরও সুমিষ্ট বলিয়া কর্ণে বাজিতেছিল। তাহার আরও নিকটে গেলাম; কিন্তু সে নিজের ভাবে এতই তন্ময় যে, আমি যে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহা দেখিতেই পাইল না। নিজের মনেই গান গাহিয়া যাইতে লাগিল,—

মন তোর এত ভাবনা কেনে,
একবার "জয় কালী, জয় কালী" বলে বস দেখিরে ধ্যানে।
ইট পাটকেল পাষাণ মুর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে,
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে।
জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে,
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা জানবে না কো জগজ্জনে।
ছাগ মেষ মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে,
তুমি "জয় কালী, জয় কালী" বলে বলি দাও ষট্‌রিপুগণে।

আমি বুঝিলাম, আজ পূজাবাড়ীর ধুমধাম ও জাঁকজমক দেখিয়া নিঃস্ব পাগলের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছে। তাই লোকালয়ের অন্তরালে নির্জ্জনে বসিয়া এই গানটি প্রাণ ভরিয়া সে গাহিতেছে। গানটি শেষ হইতেই আমি তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। এবার তাহার চমক ভাঙ্গিল। এমন সময় আমাকে নিকটে দেখিয়া সে ঈষৎ হাসিল, আমাকে তাহার পাশে বসিতে বলিল। কেন জানি না, গ্রামের মধ্যে সবার অপেক্ষা আমাকে সে যেন একটু বেশী অনুগ্রহ করিত। পাশে বসিতেই সে কাতরনেত্রে একবার আমার দিকে তাকাইল। মনে হইল যেন আমার অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া সেখানকার খবরটা সে একবার জানিতে চায়। আমি তাহাকে আর একটা

গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম। সে আমার কথায় সম্মত হইয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিল,—

হরি, দিন যে গেল, সন্ধ্যা হল,
পার কর হে আমারে,
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা,
তাই ডাকি হে তোমারে।

গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল। তাহার চক্ষু দু'টি ছল ছল করিতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম যেন অনেক কষ্টে সে তাহার অশ্রু সংবরণ করিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, বোধ হয় অতীতের কোন দুঃখময়ী স্মৃতি হৃদয়মধ্যে জাগরিত হইয়া তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, এমন সুযোগ আর উপস্থিত হইবে না। পাগলের সহিত যতই আলাপ করিতে যাই, তাহার জীবন-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার কৌতূহল ততই প্রাণে জাগিয়া উঠে। তাহার দুঃখে আমারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমি গভীর সমবেদনা জানাইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাতে বুলাইতে বলিলাম,—"ভাই, তুমি কাঁদছ কেন? অতীতের কোন কথা কি হঠাৎ মনে পড়ে গেল?" আমার করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে যেন একটু গলিয়া গেল। সে আমার হাত ধরিয়া বলিল,—"ভাই, আমার প্রাণে চিতার আগুন দিবানিশি দাউ দাউ জ্বলছে। সে যে কি অন্তর্দাহ, তা একা অন্তর্যামীই জানেন। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। সে সব কথা যখনই মনে পড়ে, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়; কিন্তু পরক্ষণেই আবার জ্ঞান হয়, আত্মহত্যা মহাপাপ। সে সব কথা কিন্তু কারও কাছে প্রকাশ

করবার নয়। সে সব শুনলে আমাকে ভালবাসা দূরে থাকুক আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতে চাবে না, পশু বলে আমাকে ঘৃণা করবে।”

এই বলিয়া পাগল চুপ করিল। আমি তখন তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম,—“ভাই, তোমার যদি অন্য কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে সে কথা আমার কাছে অনায়াসে বলতে পার। মানুষ মাত্রেরই জীবনে কিছু না কিছু ভুল-চুক হয়েই থাকে। যদিই বা মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ তুমি কোন গর্হিত অন্যায় করে থাক, তাহলে তোমার প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে ঘৃণা করা মানুষের কাজ নয়। ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে তুমি সব কথা আমাকে খুলে বলতে পার।”

সে তখন উত্তর করিল,—“ভাই, আপত্তি? আমার বলতে কোনও আপত্তি নেই; এ কথা একজনকেও বলতে পারলে মনের আগুন বোধ হয় অনেকটা নিভে যায়। আমার এ মর্ম্মযন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবে শোন ভাই, এই নিষ্ঠুর দুর্বৃত্তের অতীত কাহিনী শোন, কিন্তু শুনে পরে এ অধমকে ঘৃণা করো না। পার ত আমার দুঃখে এক ফোঁটা অশ্রু ফেলো; কিংবা সে কাহিনী শুনলে হয় ত এই পাষণ্ডের জন্যে চোখের জল ফেলা দূরের কথা, তার দিকে চাইতেও তুমি ঘৃণা করবে। তার নিঃশ্বাসের ভরও সহ্য করতে পারবে না।

“আমার বাবা প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিদ্যালয়-পরিদর্শক ছিলেন। আমরা দুই ভাই। বাবা বাল্যকাল হইতেই আমাদের পড়াশুনার যথারীতি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রায়ই বিদেশে বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করিতে যাইতে হইত। তবুও

সময় পাইলেই আমাদের দু' ভায়ের লেখাপড়া ও স্বভাবচরিত্রের উপর তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। বড় ভাই বেশ মন দিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। শিক্ষকেরা ও পাড়ার লোকেরা তাহার খুব সুখ্যাতি করিত। বলিত, বাপের যোগ্য পুত্রই বটে! আমার বাবা দেবতুল্য মানুষ ছিলেন। বাপ ভাল হইলেও ছেলে যে ভাল হয় না, এক বৃক্ষে বিষ ও অমৃত দুই ফলই ফলে, এ কথা ধ্রুব সত্য। আমার জীবনীই তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

"ছেলেবলায় আমার লেখাপড়ায় কম মনোযোগ ছিল না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমার সব কুসঙ্গী জুটিতে লাগিল। আমি ঘোর বিলাসী বাবু হইয়া উঠিলাম। সাবান না হইলে আমার একদিন স্নান চলিত না; মুখে পাউডার ও রং না মাখিয়া বাড়ীর বাহির হইতে পারিতাম না। সর্ব্বদাই মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিতাম। রুমালে গন্ধ, মাথায় টেরী, ছোট বড় চুল ছাঁটা প্রভৃতি নানা প্রকার বিলাসিতা আমার দুর্ব্বল চিত্তের উপর ক্রমেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। বাবা, মা, দাদা প্রথম প্রথম আমাকে খুব শাসন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলই ফলিল না। হায়! তখন কেন তাঁহাদের কথায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই! তাহলে আজ আর এই অসহ্য নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।" বলিতে বলিতে সে চুপ করিল। তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম,—"ভাই, সে সব কথা বলতে তোমার যদি কষ্ট হয়, তাহলে আর বলে কাজ নেই।" সে বলিল, "না, না, একটু অবসন্ন হয়ে পড়েছিলুম মাত্র। আমার আবার কষ্টের মূল্য কি? যে এ সব কাজ অনায়াসে সাধন

করিতে পারে, পিতামাতা দাদার প্রাণে অকারণ নিদারুণ যন্ত্রণা দিতে পারে, তার আবার বলিতে কষ্ট কি ?

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার অনেক সঙ্গী আসিয়া জুটিল। আজ তাহাদের সঙ্গে বায়স্কোপ দেখিতে, কাল থিয়েটার দেখিতে, পরদিন ম্যাজিক ও সার্কাস দেখিতে যাইতে লাগিলাম। অসৎ সঙ্গের ফলে যাহা ঘটে, আমার পক্ষেও তাহাই ঘটিল। আমি সিগারেট খাইতে ধরিলাম; পরে তামাক, সিদ্ধি, গাঁজা সব নেশাই বেশ জমিয়া উঠিল।. অল্প দিনের মধ্যেই আবকারী বিভাগ প্রায় একচেটে করিয়া তুলিলাম। কিন্তু তাহাতেও আমার তত অধঃপতন হয় নাই। যে দিন থেকে মদের গেলাস ধরিতে শিখি, সে দিন হইতে আমার মধ্যে যেটুকু পদার্থ অবশিষ্ট ছিল, তাহা একেবারে দূর হইয়া গেল। ভাই, সব রকম নেশাই করিয়াছি, কিন্তু মদের মত সর্ব্বনেশে নেশা দুনিয়ায় আর নাই। মদের নেশার ঝোঁকে মানুষ পশু হইয়া যায়। অন্য নেশা কর, রোজই তোমার নেশার মাত্রা কমাইয়া আনিতে অন্ততঃ ইচ্ছা করিবে, কাজে পার আর না পার, কিন্তু সুরার এমনি মহিমা যে, যতই পান করিবে ততই পানের ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠিবে। অসৎ সঙ্গে পড়িয়া ক্রমেই উৎসন্নের পথে আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

"প্রথম প্রথম মনে একটু আধটু ধিক্কার জন্মিত, পরে সে সব আর কিছুই রহিল না। স্বভাব-চরিত্র সর্ব্বপ্রকারে খারাপ হইতে লাগিল। বাবা, মা, দাদা আমার অবনতির কথা কিছু কিছু জানিতে পারিলেন। তাঁহারা মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া আমাকে সৎপথে আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মা

ছেলের মতিগতি ফিরাইবার আশায় শিবপূজা, দেবদেবীর নিকট কত মানত করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না। আমার মেজাজও ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। কেহ কোন সৎযুক্তি দিতে আসিলে তাহাকে দু'কথা শুনাইয়া দিতাম। এক দিন বাবা তিরস্কার করায় রাগে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম। অনেক দিন বাড়ী ফিরি নাই। শুনিলাম মা আমার ক'দিন মুখে জলও দেন নাই; দিনরাত আমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন। দাদা অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে মায়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ দিলেন। মায়ের অসুখ শুনিয়া কেন জানি না প্রাণটা একটু ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আমি বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। মা তখন আমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমাকে দেখিয়া তাঁহার পাংশু ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি আমাদের সবাইকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমার মাথার উপর তাঁহার দুর্ব্বল ডান হাতখানি রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, আর কথা বলিতে পারিলেন না। মৃত্যুর ক্ষণপূর্ব্বেও অবোধ সন্তানের জন্য মায়ের কত ভাবনা, কত চিন্তা, তাহা স্পষ্ট তাঁহার মুখের ভাবে ব্যক্ত হইল। পরে দাদা ও বৌদিদিকে অনেক করিয়া বলিয়া গেলেন, 'দেখিস্ বাবা, দেখো বৌমা, তোমাদের হাতেই আমার পাগলা ছেলেকে দিয়ে গেলুম; তোমরা দেখো।' বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। সতী সাধ্বী স্বামীর চরণধূলি মস্তকে লইয়া চোখ বুঝিলেন। জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দুটো মিষ্ট কথা কহিয়া মাকে সুখী করিতে পারি নাই, আমার জন্যই মা আমার শান্তিতে মরিতেও পারিলেন না, আমার

ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, এমন পাষণ্ড কি আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে!

"মায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলাম। যখন ফল বাহির হইল, দেখিলাম ফেল হইয়াছি। তাহার কয়েক দিন পরে বাবাও হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন। তখন আর আমার ইচ্ছামত সুখভোগে বাধা দিবার কেহ রহিল না। আমার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? ইয়ার্কির মাত্রা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দাদা আবার পরীক্ষা দিবার জন্য আমাকে পড়িতে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু তখন শনি আমার স্কন্ধে চাপিয়াছে, সদ্‌যুক্তি শুনে কে? আমি পড়াশুনা ত্যাগ করিলাম, চাকুরির অন্বেষণে ঘুরিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে হাতখরচ দরকার হইলে মায়ের নিকট হইতে গোপনে আদায় করিতাম, এখন যা দরকার হয়, দাদা ও বৌদিদির নিকট পাইলেও তাহাতে নিজের মানের লাঘব হইতেছে বলিয়া মনে হইল। বৌদিদি স্নেহে, যত্নে ও আদরে মায়ের স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন, দাদা কখনও কোন দিন আমাকে জানিতে দেন নাই যে, আমি পিতৃহীন। বিবাহ দিলে আবার স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইতে পারে ভাবিয়া দাদা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি স্পষ্টই বিবাহে অসম্মতি জানাইলাম। বৌদিদিও অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু আমার কথার কিছুতেই নড়চড় হইল না। তখন সখের পায়রা, বিবাহ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকা আমার পোষাইবে কেন? সংসারী হইয়া এমন স্বাধীন জীবনের সুখভোগ কি নষ্ট করিতে পারি! দাদা ইহার জন্য আমাকে মৃদু ভর্ৎসনাও করিলেন, কিন্তু বৌদিদি দাদাকে

প্রায়ই স্মরণ করাইয়া দিতেন, "দেখ ওকে কিছু বলো না, ছেলে-মানুষ, জ্ঞান হলেই সব শুধরে যাবে। মায়ের শেষ কথা মনে থাকে যেন। মা যে ওকে আমাদের হাতেই সঁপে দিয়ে গেছেন।" দাদাও সেই ভাবিয়া আমাকে তিরস্কার করা ছাড়িয়া দিলেন; তবে আমি কিসে ভাল হইব, সৎপথে আসিব, তাহাই কেবল ভাবিতেন। পাড়ার লোকে আমার নিন্দা করিলে তাঁহার কোমল প্রাণে বড়ই বাজিত। বংশের কুলাঙ্গার আমি, সমাজে সকলেই আমার অখ্যাতি করিত, তাঁহার সহ্য হইত না। মানসিক দুশ্চিন্তাভারে তিনি ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমার তখন সুখের ফোয়ারা ছুটিয়াছে! দাদার শারীরিক বা মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। আমার সঙ্গীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে; অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাসনাও প্রবলতম হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই তাড়নার স্রোতে আমি গা ভাসাইয়া দিয়াছি। লুকাইয়া হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলাম। অনেক লোভী কুসীদজীবীরই আমাদের পৈতৃক বসতবাটীর অর্দ্ধাংশের উপর লোভ পড়িয়াছিল। আমার প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া আমাকে টাকা ধার দিবার জন্য তাহাদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া গেল। একদিন এক অসৎসংসর্গে পড়িয়া চৌর্য্য অপরাধে পুলিসে ধৃত হইলাম। তাহাতে আমার কারাবাসের খুবই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু দাদা বিস্তর টাকা ধার করিয়া ভাল কৌন্সিলি দিয়া আমাকে আদালতে নির্দ্দোষ প্রমাণ করাইয়া কারাগার হইতে উদ্ধার করিলেন। সে দিন তিনি আমার গায়ে পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহমাখা স্বরে অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কত বুঝাইলেন, এমন কি শেষে ভয় দেখাইলেন, আমি যদি

সৎপথে না আসি, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবেন। হায়, তখনও যদি সাবধান হইতাম, তাহাতেও যদি আমার চক্ষু ফুটিত! দাদার এ একটা কৌশল ভাবিয়া আমি হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিলাম।

"একবার আমার কিছু বেশী টাকার দরকার হইল। বাবা নগদ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তবে একখানা বাড়ী ও কিছু জমিজমা রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমার বন্ধুরা বুঝাইয়া দিল, দাদাকে বলিয়া পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে। তাহার কিছু অংশ বিক্রয় করিলেই আমার টাকা উঠিবে, সব দেনাও শোধ যাইবে; এবং বাকি অর্থের দ্বারা আমি একলা মানুষ, আমার অবশিষ্ট জীবন বেশ সুখেই অতিবাহিত হইবে। আমার আয় হইতে দাদার সংসারে সাহায্য হইতেছে। আমি কেন তাহাদের ভার বহন করিব? তাহারা আরও বুঝাইয়া দিল, এই যে দাদা ও বৌদিদি আমাকে এখন বাহ্যিক এত আদর-যত্ন করিতেছে, এ সম্পূর্ণ কৃত্রিম; তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য আমার বিষয়-সম্পত্তির অংশটুকু হস্তগত করা। বন্ধুদের সুপরামর্শে আমার চোখ খুলিয়া গেল। এতদিন তাহলে আমি ত এটা বুঝিতে পারি নাই! নিজেকে নির্ব্বোধ ভাবিয়া তাহাদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করাই যুক্তিসঙ্গত স্থির করিলাম। সেই দিনই বাড়ী গিয়া বৌদিদিকে দিয়া বাড়ী ও বিষয়-সম্পত্তি ভাগের কথা দাদাকে বলাইলাম। হায়, এত বড় নির্লজ্জ আমি যে, সে কথা তাঁহাদের সম্মুখে উত্থাপন করিতে আমি বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করিলাম না। দাদা এ প্রস্তাব শুনিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'আমি বেঁচে থাকতে তোকে কিছুতেই পৃথক

হতে দেব না।' বৌদিদিও চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় আমাকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, বিষয়ের অর্দ্ধেক অংশ আমার চাই-ই! দাদাও কিছুতেই রাজি হইলেন না। বন্ধুদের সতর্কবাণী স্মরণ করিয়া দাদাকে তখন চোর, বাটপাড়, ঠক্ ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিলাম। তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র রাগান্বিত না হইয়া কেবল বলিলেন,—'আগে আমাকে মেরে ফেল্, তারপর তুই পৃথক হবি।' 'আচ্ছা, দেখে নেব। কোম্পানীর রাজত্বে কাকেও ঠকিয়ে নেবার আর যো নেই' বলিয়া ঝড়ের ন্যায় বেগে সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। যে মুখে দাদাকে এ সব পাপ কথা বলিয়াছিলাম, সে মুখে এখনও এত কথা বলিতে পারিতেছি, এখনও আমার জিহ্বা খসিয়া যায় নাই, এ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। তাই মধ্যে মধ্যে ভাবি, ভগবানের পুণ্য রাজ্য হইতে কি পাপীর শাস্তি উঠিয়া গেল!

"আমার সঙ্গীরা তখন উপদেশ দিল, আদালতে বিষয় ভাগের জন্য নালিশ করিতে। একজন উকিলও বরাতজোরে জুটিয়া গেল। সে নিজের খরচে এখন মকোদ্দমা চালাইতে রাজি হইল, পরে জিতিলে তাহাকে বিষয়ের অর্দ্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমি ঝোঁকের মাথায় তাহাতেই রাজি হইলাম, দু'চার দিন পরেই আদালতে ভাগবাঁটোয়ারার আর্জ্জি পেশ করিলাম। যথাসময়ে দাদার নামে শমন বাহির হইল। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। এবার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ভোগ করুক্। আমাকে বোকা পেয়ে ফাঁকি দেবার চেষ্টা, কিন্তু আইনের চোখে ধূলি দিবার যো নাই বাবা! শমন পাইবার দিন রাত্রেই

দাদা প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ক্রমেই তিনি উত্থানশক্তিরহিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া স্নেহের তরল ধারা দিবারাত্র প্রবাহিত হইতে লাগিল। আর বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তিনি কেবল প্রলাপ বকিতে লাগিলেন,—'ভাই, ভাই, ভাগ কেন? তুই সব নে। মা, তোমার অন্তিমকালের আদেশ যে পালন করতে পারলুম না!'

"আদালতে জবাব দিবার দিন তিনি হাজিরও হইলেন না বা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন উকিলও নিযুক্ত করিলেন না। হাকিম তখন আমার উকিলের কথা শুনিয়া দাদাকে যথার্থই প্রতারক বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন এবং আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি মীমাংসা করিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ভাগের জন্য আদালত হইতে লোক পাঠাইবার হুকুম দিলেন। তখন আনন্দে আমার প্রাণ মেঘগর্জ্জনে ময়ূরের ন্যায় নাচিয়া উঠিল। আমি ইয়ার-বন্ধু লইয়া জোর মজলিস লাগাইয়া দিলাম। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সুরাপানে মত্ত থাকিয়া উন্মত্ত অবস্থায় বাড়ী আসিয়া শুনি, আমাদের বাড়ী হইতে উচ্চ ক্রন্দন রোল আসিতেছে। আমার ছোট ভাইঝির করুণস্বরে 'বাবা গো' চীৎকার-ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমার পা আর নড়িল না। মনে হইল কে যেন আমার পৃষ্ঠে সজোরে শঙ্কর মাছের চাবুক মারিল। আমি জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সেখানে বসিয়া পড়িলাম। নেশার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন আমার জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখ হইতে আজ পর্দ্দার আবরণ সরাইয়া দিল। ছেলেবেলার পর প্রথম জ্ঞান হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত একে একে সব ঘটনা আমার স্মৃতিসমুদ্র মথিত করিয়া তুলিল। তবে কি

আমিই পিতার মনে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলাম? মায়ের মৃত্যুর কারণ কি আমিই? দাদা আজ যে স্নেহের অভিমানভরে সুখদুঃখের অতীত কোন স্থানে চলিয়া গেলেন, আমিই কি সেই ভ্রাতৃহন্তা? না, না, তাও কি সম্ভব? একজন মানুষের দ্বারা কি এত পৈশাচিক ঘটনা সম্পন্ন হইতে পারে? কাছ দিয়া একটা কুকুর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, যেন অতি সাবধানেই সে আমার পাশ কাটাইয়া গেল, পাছে আমার অপবিত্র দেহ স্পর্শ করিলে তাহার পাপ হয়। মনে হইল যেন ঘৃণাভরে আমার দিকে মুখ বাঁকাইয়াই সে চলিয়া গেল। তবে কি সত্যই আমি ঘৃণিত কুকুরেরও অধম, তাহারও অবজ্ঞার পাত্র?

"পাড়ার লোকেরা সব হায় হায় করিতেছে। পাড়ার অতি বড় অসজ্জনও দাদাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। আমিই কেবল সে মহৎ হৃদয়ের উচ্চতা অনুভব করিতে পারি নাই। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর দরজায় এক খাট আসিল। জনকতক লোক বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। অমনি কান্নার রোল আরও জোরে উঠিতে লাগিল। একবার মনে হইল, বাড়ীর ভিতর দৌড়িয়া যাই। অমনি অতীতের স্মৃতি তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় হৃদয়ে আসিয়া বিঁধিল। যে মাতৃকল্পা সীমন্তিনীর অগাধ স্নেহ ও ভালবাসার প্রতিদানে তাহার সিঁথির সিন্দুরবিন্দু নিজ হস্তে মুছাইয়াছি, যে স্নেহশীলা শিশু বালিকার 'বাবা' বলা জন্মের মত ঘুচাইয়াছি, কোন প্রাণে এখন তাহাদের সম্মুখীন হইব? পাড়ার লোকেরা 'বল হরি' বলিয়া খাট উঠাইল। তাহারা শ্মশানাভিমুখে চলিল। আমিও উঠিয়া অলক্ষিতে তাহাদের পিছু পিছু চলিলাম। শ্মশানে গিয়া শব নামাইয়া তাহারা সৎকারের যথারীতি অনুষ্ঠান-

গুলি সম্পন্ন করিল। পরে চিতাকাষ্ঠের উপর শব চড়াইয়া একজন প্রশ্ন করিল,—'লোক ডাকতে গেল, সে হতভাগা এখনও এলো না! যে আজীবন দাদার প্রাণে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে এসেছে, আজ শেষ একবার মুখ-অগ্নিটাও করে যাক্।' আমি আর নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারিলাম না। কে যেন আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বলিয়া উঠিল,—'জীবনে যাকে একদিনও একটা মিষ্ট কথা কহিয়াও সুখী করিতে পার নাই, আজ তাহার শেষ কাজটা সম্পন্ন ক'রে তার আত্মার সদ্গতির উপায় কর, যদি তাতে পাপের বোঝা কিঞ্চিৎ লাঘব হয়!'

"আমি দৌড়িয়া শবের সম্মুখীন হইলাম। আমাকে দেখিয়া সবাই একটু পিছাইয়া গেল। কেহই কিছু বলিল না। একবার দাদার মুখের দিকে, একবার তাঁহার পায়ের দিকে চাহিলাম। ইচ্ছা হইল, একবার দাদার পা দু'খানি ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া লই। কিন্তু সে পবিত্র দেহ এই পাপ হস্তে স্পর্শ করিতে ভয় হইল। বাল্যকালে যে মুখে 'দাদা' বলিয়া আদরে কত চুমু খাইয়াছি, আজ ধীরে ধীরে কম্পিতহস্তে সেই মুখে অগ্নি জ্বালিয়া দিলাম। দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে সকলে যে যার বাড়ী চলিয়া গেল। তাহারা যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্য কেহই কিছু বলিল না। আমার মনের ভিতর তখন যে কি তীব্র হাহাকার উঠিতেছিল, তাহা যদি তাহারা ঘুণাক্ষরেও টের পাইত, তাহা হইলে আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া তাহারা কিছুতেই থাকিতে পারিত না। আমি শ্মশানের এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসিলাম। এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম

না। নয়নে অশ্রুর বন্যা বহিল। আমি ভূমিতে লুটাইয়া কাতর-ভাবে ফুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

"একবার ভাবিলাম বাড়ী ফিরিয়া যাই; বৌদিদির পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিয়া তাহাদের সান্ত্বনা দিই গে। এ সময় তাহাদের শান্ত করিবার আর কেহই নাই যে! কিন্তু সাহস হইল না। সেইদিন আমি প্রথম গৃহ ত্যাগ করি। গ্রামের আশে পাশেই ঘুরিতাম, লোকমুখে বৌদিদির ও শিশু পুত্রকন্যার সংবাদ লইতাম; কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের সম্মুখীন হইয়া ভাইঝি ও ভাইপোকে বুকে ধরিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে ভরসা হইল না। শেষে একদিন একজনের নিকট শুনিলাম, 'বৌদিদির বাবা তাহাদের পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনেক সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও তিনি স্বামীর ভিটা ত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকৃতা হন নাই। দাদার নাকি বৌদিদির প্রতি শেষ আদেশ, আমি অবোধ, পিতৃমাতৃহারা, আমার যেন কোনও কষ্ট বা অযত্ন না হয়!' ইহা শুনিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে মান, অপমান, চক্ষুলজ্জার ভয় সবই মন হইতে দূর হইয়া গেল। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে বৌদিদির চরণতলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্ষমাময়ী স্নেহশীলা বৌদিদি তৎক্ষণাৎ আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন,—'ভাই তোমার জন্যেই আমি এখানে এখনও আছি। শেষমুহূর্ত্তে তোমাকে একবার দেখবার জন্যে তিনি বড়ই কাতর হয়েছিলেন। তোমার নাম করতে করতেই তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়।' আমি অধীর হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম। ছোট ভাইঝিটি আমার কোলের উপর আসিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কোলের ছেলেটি

ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। হায়, আমিই তোদের পিতৃহন্তা, মনুষ্যাকারে পিশাচ, কাকা নয় রাক্ষস! এই আমার জীবনকাহিনী। এ কথা অপরিচিত আর কাহাকেও বলিতে সাহস করি নাই। ভাই এমন দাদা কি আর কাহারও ভাগ্যে জুটে! জন্মজন্মান্তরের কত পুণ্যফলে তাঁহাকে পেয়েছিলাম, কিন্তু মূর্খ আমি, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই! আমার দুঃখের কথা শুনে তোমার চোখের কোণে কি এক বিন্দুও জল আসিবে না! আমাকে পশু বলে ঘৃণা করবে না তো?"

এই বলিয়া সে চুপ করিল। তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। গাছের ডালের ফাঁক দিয়া সন্ধ্যাতারা উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। প্রকৃতিদেবী এক উদার শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন! পাগল আমার বুকের ভিতর মাথা লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম, হতভাগ্য জীব যেন মনে বিন্দুমাত্রও শান্তি লাভ করে! সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"ভাই, দাদার গুণের কথা এক মুখে কত বলব! একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। এই দ্বিতীয় বার গৃহত্যাগের কারণই হচ্ছে তাই। বৌদিদির সেবা করা, ভাইপো ভাইঝিকে মানুষ করাই আমার তখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। বৌদিদি বিবাহ করিবার জন্য আমাকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু পাছে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই এই ভয়ে সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলাম না। জমিজমা কিছু বিক্রয় করিয়া বাজারের ঋণ সব শোধ করিলাম। উকিলবাবুকেও

আদালতের খরচের টাকা ও তাহার পারিশ্রমিকস্বরূপ কিছু দিলাম। এ কার্য্যে বৌদিদি নিজে আমাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। আমি গ্রামের মধ্যেই কাপড়ের এক কারবার খুলিলাম। আমার স্বভাব-চরিত্রেরও অদ্ভুত পরিববর্ত্তন হইতে লাগিল। কুসঙ্গ ছাড়িলাম, নেশা করা ত্যাগ করিলাম। অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের সহিত ব্যবসা চালাইতে লাগিলাম। কাপড়ের ব্যবসা হইতে যাহা লাভ হইত, তাহাতেই আমাদের সংসার এক প্রকার সচ্ছলে চলিয়া যাইত। কার্য্যের মধ্যে যেটুকু অবসর পাইতাম, ভাইপো ও ভাইঝিকে লইয়া আদর-যত্ন করিতাম, ভাইঝিটিকে মধ্যে মধ্যে অল্প স্বল্প পড়াইতাম। এই রকমে দিন এক প্রকার কাটিয়া যাইতে লাগিল। একদিন দাদার ক্যাশবাক্সের মধ্যে পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একখানি দলিল আমার নজরে পড়িল। দলিলখানি খুলিয়া পড়িয়া দেখি, এ যে বাবার উইল! এ উইলে যে বাবা আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়া দাদাকেই সব বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী করে গেছেন। তা সত্ত্বেও আমি ভাগবাটোয়ারার নালিশ করিলে দাদা আদালতে হাজির হন নাই। এ কথা দাদা এমন কি বৌদিদির নিকটও ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন নাই। ভাই, আমার আর মাথার ঠিক রহিল না। আমি সেই দিনই কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার গৃহ ত্যাগ করিলাম। এক মাস হইল এখানে রয়েছি, তাদের দেখবার জন্তে প্রাণ আবার বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু অতীতের চিন্তা এত চেষ্টা করেও বিস্মৃতিসাগরে ডুবাতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হয় স্মৃতিটাকে বাহিরে টানিয়া নখয়া-ঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলি; কিন্তু যতই চেষ্টা করি, ততই

যেন সেটা ভীষণকায় দৈত্যের মত ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসে। ভাই এর হাত হতে কি কিছুতেই নিস্তার নাই ?"

আমি তখন তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য অনেক বুঝাইলাম। বৌদিদি ও ছেলেমেয়েদের সংস্রবে থাকিলে তাহার মনের অশান্তি অনেকটা দূর হইয়া যাইবে। রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া আমরা বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম। পাগল পথে যাইতে যাইতে মনের আবেগে একটি গান ধরিল,—

পাতকী বলিয়া কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয় !
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয়।
করিতে এ ধূলাখেলা, অবসান হলো বেলা,
খেলার সাথী ছিল যারা, ফেলে গেল অসময়।
হারাইয়া লাভে মূলে মরণের সিন্ধুকূলে,
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায় !
জীবনে কখনও আমি, ডাকিনি হৃদয়স্বামী,
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময় ?

নিশার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে এ স্বর উত্থিত হইতেছে। বড়ই প্রাণস্পর্শী, বড়ই করুণ শুনাইতেছিল !

পরদিন সকালে তাহার সংবাদ লইতে গিয়া শুনিলাম, পাগল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সকলেই ভাবিল, পাগল নিজের খেয়ালের বশেই হঠাৎ এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছে। কিন্তু আমি তাহার স্থানত্যাগের দু'টি কারণ স্থির করিলাম। প্রথমটি হয় ত লজ্জায় আমার নিকট আর মুখ দেখাইতে পারিবে না বলিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছে, কিংবা বাড়ীর জন্য তাহার

প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সেইখানেই ফিরিয়া গিয়াছে। শেষোক্ত কারণটিই আমার বেশী যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু গত রাত্রে তাহার নিকট হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সংসার সংগ্রামে জয়ী হইবার তাহা যে প্রধান অস্ত্র! কিন্তু সে জন্য তাহার নিকট ত আমার কৃতজ্ঞতা জানান হয় নাই! তাহার নামধাম সে ত কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। ভদ্রতার খাতিরে সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসাও করিতে পারি নাই। তাই যখনই বিদেশে যাই, পথে ঘাটে বিশেষ নজর রাখি যদি হঠাৎ তাহার সন্ধান পাই। তা'হলে একবার তাহার হাত ধরিয়া বলিব,—"ভাই তোমার কাছে আমি বড় কৃতজ্ঞ। নিজের জীবনে অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করে, যে অমূল্য উপদেশ আমাদের জন্যে সঞ্চিত করে রেখে গেছ, তার সাহায্যে আমরা অবাধে এই ভবসমুদ্র পার হয়ে যাব!" জীবনে আর কি একবারও তাহার দেখা পাইব না?

বল্লাল-কাহিনী

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় স্বাধীন রাজগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালের কোন ঘটনাই অদ্যাবধি ইতিহাসে নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু রামপালে অদ্যাপি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাঁহার যশঃসৌরভ বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরেও সংঘটিত ঘটনাবলি তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া জনশ্রুতি নিরূপণ করিয়া থাকে।

তাঁহার জন্মবৃত্তান্তও গভীর রহস্যময়। কেহ কেহ তাঁহাকে আদিশূরের পুত্র বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। কথিত আছে, তাঁহার মাতা, শূর-রাজবংশোদ্ভূতা বিলাস দেবী আদিশূরের বড়ই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। একদিন রাজা মহিষীর চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। সমাজচ্যুতা রাণী নিরাশ অন্তঃকরণে চিরশান্তি লাভের আশায় ব্রহ্মপুত্র নদে ঝাঁপাইয়া পড়েন। কিন্তু পুণ্য-সলিল নদ তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে অপর তীরে পেঁাছাইয়া দেন এবং নিকটবর্ত্তী বুড়ী-গঙ্গার তীরস্থিত দুর্গা দেবীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। এই নদীর পার্শ্বস্থ এক অরণ্যের ভিতর রাণী তাঁহার পুত্র সন্তান প্রসব করেন। দেবীর আশ্রয়েই কুমার লালিত পালিত হইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির

সহিত তিনি নানাপ্রকার ব্যায়াম-কৌশলে পারদর্শী হইলেন এবং রাজপুত্রের উপযুক্ত বুদ্ধি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিশোর বয়সে একদিন বনমধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে বল্লাল তাঁহার রক্ষাকর্ত্রী দুর্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি জঙ্গলের ভিতর লুক্কায়িত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানেই পরে তিনি দেবীর সম্মানার্থ ঢাকেশ্বরীর (লুক্কায়িত দেবী) মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই মন্দিরের নাম হইতেই দেশের নাম ঢাকা হইয়াছে। দেব-দেবীর অনুগ্রহে বল্লাল সেন যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার পিতা লোকমুখে পুত্রের গুণাবলীর কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। যুবক রাজসভায় আনীত হইলে, রাজা তাঁহার রূপ-গুণে বিশেষ মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

অদ্যাবধি রামপালে প্রাচীন কীর্ত্তি যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহারই সহিত বল্লাল সেনের নাম জড়িত। তিনি বড় বড় অট্টালিকা ও পথ নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, কিরূপ বৃহৎ আয়তনে এ অট্টালিকার নক্সা প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রায় তিন হাজার স্কয়ার ফিটব্যাপী ভূমির উপর এই প্রাসাদ বিস্তৃত ছিল এবং দুই তিন শত ফিট প্রশস্ত খাতের দ্বারা চতুর্দ্দিক বেষ্টিত। পূর্ব্বদিকে প্রাসাদে প্রবেশের একমাত্র পথ। এখন কেবল মৃত্তিকা-স্তূপই পরিখা-বেষ্টিত সেই বৃহৎ প্রাসাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। যে স্থানে রাজা ও রাজপুত্রগণ সভার অধিবেশন করিতেন, সৈন্য-দল শিবির স্থাপন করিত, সে ভূমি কৃষকগণ আজ নির্ব্বিঘ্নে কর্ষণ করিতেছে। এই রাজ-প্রাসাদের গাত্র হইতে ইষ্টক খুলিয়া

বর্ত্তমানে রামপালে অনেকগুলি বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিবার সময় অনেক ইট সেখানে লইয়া যান। বহুকালের পরিত্যক্ত এই মৃত্তিকাস্তূপাভ্যন্তরে বহু ধনরত্ন নিহিত আছে বলিয়া জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে, এবং প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে একজন কৃষক সমীপস্থ ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে ৭০ হাজার টাকা মূল্যের এক অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড পাইয়াছিল। জনসাধারণের ধারণা, এ হীরকখণ্ড নিশ্চয়ই একদিন বল্লাল সেনের প্রাসাদের শোভা বর্দ্ধন করিত।

বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত রাস্তাগুলি সবই বিস্তৃত ও উচ্চ। একটি বড় রাস্তা রামপাল হইতে পদ্মা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তা সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলে এক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গংদেশে মাছের কাঁটা বিদ্ধ হইয়া রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। এই সংবাদ শ্রবণে ভীত হইয়া তিনি মৎস্যাহার একেবারে বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু পদ্মা নদীতে কেচকি নামে একজাতীয় মাছ পাওয়া যায়, যাহার কাঁটা নাই। রাজা নদী হইতে দেশে সেই মৎস্য আনাইবার জন্য এই পথ নির্ম্মাণ করান। তদবধি এই পথ "কেচকি দরওয়াজা" নামেই অভিহিত।

বল্লাল সেনের প্রাসাদের নিকট "রামপাল দীঘি" নামে যে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে, তাহারও খনন সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই দীঘি দৈর্ঘ্যে আধ ক্রোশ, প্রস্থে পাঁচশত গজ। হিন্দুরাজগণ কিরূপ বৃহৎ আয়তনে প্রাসাদ, অট্টালিকা, পথ, পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন, ইহা

তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সংস্কারের অভাবে এই দীঘির অধিকাংশ ভাগই এখন ভরাট ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সে উর্ব্বর ভূমিতে কৃষকগণ এখন ধান্য উৎপাদন করিতেছে।

জনসাধারণের হিতার্থে ও দেবতাগণের অনুগ্রহ লাভের আশায় তিনি এই মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত হন। দীঘির আয়তন নির্দ্ধারণের জন্য তিনি এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে তাঁহার মাতা একদমে কোন স্থানে না থামিয়া যতদূর পদব্রজে যাইতে পারিবেন, দীঘির দৈর্ঘ্যও ততদূর বিস্তৃত হইবে; এবং রাত্রের মধ্যেই সেই স্থান খনন করাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাজমাতা অতি অল্পই পদব্রজে বাহির হইয়াছেন। সেইজন্যই জননীর অক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, দীঘির দৈর্ঘ্যের সীমাও বেশী বিস্তৃত হইবে না; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাতার পদব্রজে গমনশক্তির বিষয় তিনি ভুল ধারণা করিয়াছিলেন। বস্ত্রাবৃতা হইয়া পুত্র ও মন্ত্রীগণের সমভিব্যাহারে রাজমাতা প্রাসাদ হইতে দক্ষিণ মুখে যাত্রা করিলেন। পদব্রজে গমনে তাঁহার বিশেষ স্ফূর্ত্তিই লক্ষ্য হইল এবং কিছুদূর গিয়াও তাঁহার কোন অবসাদের চিহ্ন দেখা গেল না। রাজা বড়ই ভীত হইলেন। ভাবিলেন রাজমাতা এই গতিতে আরও বেশীদূর অগ্রসর হইলে, রাত্রের মধ্যে এত বড় দীঘি খনন করাইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে; অধিকন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে মহাপাপের ভাগী হইতে হইবে। জননীকে আরও অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাজা বড়ই চিন্তিত হইলেন। পক্ষান্তরে তাঁহারই কষ্টসহিষ্ণুতার উপর প্রজাগণের সুখের সীমা ও পরিমাণ নির্ভর করিতেছে, এই

ভাবিয়া রাজমাতা স্বয়ং পথভ্রমণজনিত ক্লেশ ও অবসাদ স্বীকার করিয়াও সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মনে হইল যেন দৈব অনুগ্রহে তিনি নববলে বলীয়ান হইয়াছেন। ব্যাপার ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। বল্লাল সেন নিরুপায় হইয়া এক কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন।

মাতার অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরণের উপরিভাগ অলক্তকরাগ-রঞ্জিত করিতে তিনি চাকরদিগকে আদেশ করিলেন। এক অনুগত ভৃত্য তাঁহার আদেশ পালন করিলে, তিনি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"রাজমাতার চরণে জোঁক ধরিয়াছে।" রাজমাতাও পায়ে লাল দাগ দেখিয়া রক্ত বলিয়া মনে করিলেন এবং ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য থামিয়া গেলেন। এই স্থানই দীঘির শেষ সীমা, প্রাসাদ হইতে প্রায় আধ ক্রোশ দক্ষিণে। তৎক্ষণাৎ রাজা বহুসংখ্যক শ্রমজীবী সংগ্রহ করিয়া খনন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন এবং রাত্রির মধ্যেই সেই বৃহৎ দীঘি খনন করাইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

দৈর্ঘ্যে এই দীঘির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। কিন্তু বল্লাল সেন দীঘির আয়তন অযথা বর্দ্ধিত হইবার ভয়ে যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য দেবতাগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং দীঘিটি গভীর হইলেও, শুষ্ক হইয়া রহিল। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, দীঘি আর জলপূর্ণ হইল না। রাজা বড়ই লজ্জিত হইলেন। অবশেষে তাঁহার বন্ধুবর রামপাল এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন, দেবী যেন তাঁহাকে প্রজাগণের হিতার্থে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আদেশ করিতেছেন; তাহা হইলেই দীঘি জলপূর্ণ হইয়া উঠিবে। পর-

দিন তিনি রাজা ও দেশবাসিগণকে দীঘির পাড়ে সমবেত করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনের কথা বলিলেন,এবং উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই দীঘির গভীর তলদেশে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইলেন। তৎক্ষণাৎ শত শত জলস্রোত কোথা হইতে আসিয়া দীঘিটিকে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। রামপালও সেই অগাধ জলরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইলেন, আর পাড়ে উঠিতে পারিলেন না। বিস্মিত দর্শকবৃন্দ সমস্বরে "রামপাল, রামপাল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই জলরাশি দীঘিটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। রামপালের চিহ্ন মাত্রও আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বল্লাল সেন বন্ধুর জন্য দুঃখ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আমারই পাপে আমার বন্ধুর মতুা ঘটিয়াছে। তাহার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। এই দীঘি অদ্যাবধি রামপালের নামেই অভিহিত হইবে।" তদবধি ইহা "রামপালের দীঘি" নামেই খ্যাত। এই ঘটনা হইতে এ প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়,—"দীঘির নাম হইতেই কি দেশের নামকরণ হইয়াছে ?"

এই দীঘির অদূরেই একটি পুষ্করিণী আছে। রামপাল দীঘির সহিত ইহার উৎপত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট। কথিত আছে, উক্ত দীঘি খননের পর বল্লাল সেন প্রত্যেক শ্রমজীবীকে সমীপস্থ এক স্থান হইতে এক কোদাল করিয়া মাটি খুঁড়িতে আদেশ করেন। শ্রমজীবীদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, তাহারা প্রত্যেকে এক কোদাল করিয়া মাটি খুঁড়িতেই স্থানটি এক বৃহৎ পুষ্করিণীতে পরিণত হইল। ইহার আয়তন ১০৫০ ফিট দীর্ঘ ও ৭৫০ ফিট প্রস্থ। উহা এখনও "কোদালধোয়া দীঘি" নামে অভিহিত হয়।

রামপাল দীঘির উত্তর পাড়ে একটি বিশাল গজারি বৃক্ষ আছে। ইহার উচ্চতা প্রায় দেড় শত ফিট। ইহা বহুকাল ধরিয়া ঐ স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিগণ বৃক্ষটিকে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা বৃক্ষটি অমর এবং ইহার অসাধারণ গুণ ও দৈবশক্তি আছে। ইহার পত্রে অনেকের দুরারোগ্য রোগের উপশম হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে। ইহার পাতা ছেঁড়া ও ডাল কাটা বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। একবার একজন ফকির এই বৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় লইয়া ইহার ডাল কাটিয়া অগ্নিসংযোগে তাঁহার সান্ধ্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অন্ন মুখে করিবামাত্র তিনি রক্ত বমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগণ এই পবিত্র বৃক্ষতলে বসিয়া সন্তানলাভের জন্য ঠাকুর-দেবতার পূজা করিয়া থাকে এবং কৃষকেরা সন্তোষজনক শস্য লাভের আশায় ইহার অনুগ্রহপ্রার্থী হয়। বহুদিন পূর্ব্বে ইহার সম্মানার্থে নিকটেই প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে এক মেলা বসিত।

বল্লাল সেনের মৃত্যু সম্বন্ধেও এক অদ্ভুত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। রামপালের অদূরেই আবদাল্লাপুর নামক গ্রামে এক ঘর মুসলমান বাস করিত। বাড়ীর কর্ত্তা নিঃসন্তান ছিলেন এবং বহুদিন ধরিয়া ঈশ্বরের নিকট পুত্রের জন্মকামনা প্রার্থনা করিয়াও যখন তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না, তাঁহার মনে গভীর অশান্তির সঞ্চার হইল। এমন সময় একদিন এক ফকির ভিক্ষা লাভের আশায় তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফকিরকে মুষ্টিভিক্ষা দানে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে

এই বলিয়া স্থানান্তরে যাইতে আদেশ করিলেন,—"আল্লা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন নাই, আমি তাঁহার নামে আর ভিক্ষা দিব না।" কিন্তু সর্ব্বদর্শী ফকির উত্তর করিলেন,—"আল্লা আপনার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আপনি শীঘ্রই পুত্র সন্তানের মুখ দেখিবেন।" মুসলমান আনন্দে অধীর হইয়া ফকিরকে ভিক্ষা দিলেন এবং আরও বলিলেন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি ফকিরকে খুব সন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। ফকির যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,— "আমাকে আর কিছু দিতে হইবে না; কেবল আল্লার তৃপ্ত্যর্থে একটি গরু জবাই করিও।"

যথা সময়ে মুসলমানের একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। ফকিরের আদেশমত তিনি গরু জবায়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হিন্দু প্রতিবেশীরা তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। প্রতিজ্ঞাপালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি সমীপস্থ জঙ্গলের ভিতর গমন করিয়াই জবাই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরে পরিবারবর্গের আহারোপযোগী মাংস লইয়া অবশিষ্ট মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে পুতিয়া ফেলিলেন। গৃহে ফিরিবার পথে এক চিল এই মাংসের কিয়দংশ তাঁহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া বিক্রমপুর অভিমুখে উড়িয়া গেল এবং রাজার প্রাসাদের সম্মুখেই তাহা ফেলিয়া দিল। রাজা ইহা হিন্দুগণের উপাস্য গরুর মাংস বলিয়া চিনিতে পারিয়া, এই গর্হিত কার্য্য কে করিয়াছে সন্ধান লইবার জন্য নানা স্থানে চর পাঠাইলেন। জঙ্গলে অনুসন্ধান করিবার সময় তাহারা দেখিতে পাইল, একদল শৃগাল সেই মৃত্তিকা-প্রোথিত মাংসখণ্ড তুলিয়া খাইতেছে। এবং পথে লইয়া যাইবার সময় হস্তস্থিত মাংস হইতে পতিত রক্তবিন্দুর দাগ অনুসরণ করিয়া

সেই মুসলমানের গৃহদ্বারে গিয়া পৌছিল। রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আদেশ করিলেন,—"যে শিশুর মঙ্গলার্থে এই গো নিহত হইয়াছে, তাহাকে কল্য প্রাতে প্রাসাদে আনিয়া বধ করা হইবে। যাহার জন্মোৎসবে এত বড় এক পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বাঁচিয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে।"

মুসলমান ভিতর ভিতর রাজ-আজ্ঞা অবগত হইয়া, সেই রাত্রেই স্ত্রী ও নবজাত শিশুপুত্রকে লইয়া বাসভূমি ত্যাগ করিলেন এবং ভারতবর্ষ পার হইয়া তাঁহার আদিম নিবাসস্থান আরব্য দেশে উপস্থিত হইলেন। মক্কানগরীতে বাবা আদম নামক এক ফকিরের সাক্ষাৎ পাইয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার পলায়ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। এরূপ দেশ আছে, যেখানে মুসলমানেরা স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারে না, ইহা শুনিয়া বাবা আদম সধর্ম্মীগণের ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতা লাভ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন এবং শত সহস্র অস্ত্রে সজ্জিত অনুচর সংগ্রহ করিয়া বিক্রমপুর যাত্রা করিলেন। পথে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি সদলবলে বল্লাল সেনের রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনেক গো, বৃষ নিহত হইতে লাগিল এবং নেমাজ পড়িবার পূর্ব্বে স্বধর্ম্মীগণকে মসজিদে হাজির করিবার আহ্বান-ধ্বনি রাজার প্রাসাদমধ্যেও ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বল্লাল সেন রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি আগন্তুক-দের নিকট দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন,—"হয় তোমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও; নচেৎ হিন্দুগণের ধর্ম্মবিরোধী আচার-

অনুষ্ঠান হইতে বিরত হও।" কিন্তু বাবা আদম অসংখ্য অনুচরের সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া রাজাকে উদ্ধতভাবে উত্তর পাঠাইলেন,—"ঈশ্বর এক এবং একমাত্র মহম্মদীয় ধর্ম্মই পবিত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মানুযায়ী আচার আমরা অনুষ্ঠান করিব। বিধর্ম্মী বল্লাল সেন যাহা ইচ্ছা করিতে পারে।" হিন্দু রাজা সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিয়া বাবা আমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। রাজধানী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রাসাদের ভিতর এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মিত করাইলেন। বলিয়া গেলেন, যদি তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, বিজয়ী মুসলমানদের হাতে পড়িয়া অপমানিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পরিবারবর্গ প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। পাছে বিজয়ী শত্রু সৈন্য হঠাৎ অতর্কিতভাবে প্রাসাদ আক্রমণ করে এই ভয়ে তিনি এক সঙ্কেত চিহ্নও নির্দ্দেশ করিলেন। তাহার দ্বারা প্রাসাদস্থ নরনারী বুঝিতে পারিবে যে, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার যুদ্ধসজ্জার ভিতর এক পত্রবাহক পারাবত সঙ্গে করিয়া লইলেন। যুদ্ধে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলে তিনি পারাবতটিকে মুক্ত করিয়া দিবেন; সে প্রাসাদে উড়িয়া আসিলেই তাহারা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে।

বর্ত্তমানে যেখানে বাবা আদমের মসজিদ অবস্থিত, সে স্থানে দুইদল সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ভীষণ সংগ্রামে নিরত হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া জয়পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। পরে জয়লক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে বল্লাল সেনের পক্ষই অবলম্বন করিলেন। মুসলমানেরা যুদ্ধে পরাজিত হইল। তাহাদের অধিকাংশ সৈন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইল। শেষে বল্লাল সেন বাবা আদমের সাক্ষাৎ পাইলেন।

তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়। ফকির পরাজয়ে আদৌ বিচলিত হন নাই। মক্কার দিকে মুখ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া সান্ধ্য নেমাজ পড়িতেছিলেন। কথিত আছে, বল্লাল সেন উপাসনানিরত শত্রু সেনাপতিকে তরবারির দ্বারা আঘাত করিলেন; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তরবারির আঘাত ফকিরের গায়ে কোনও রেখাপাত করিতে পারিল না। ফকির তখন উঠিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দুই বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্ম্মের নেতা আজ পরস্পর মুখোমুখী। ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নেমাজ পড়বার সময় কেন আমাকে বাধা দিচ্ছ?" বল্লাল সেন উত্তর করিলেন,—"হিন্দুজাতির উপাস্য দেবী গো হত্যা তুমি করিয়াছ। তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি ফকিরকে পুনর্ব্বার তরবারির দ্বারা আঘাত করিলেন। ফকিরের দেহ বোধ হয় লৌহনির্ম্মিত ছিল। এবারও সেই তীক্ষ্ণ অসিধারা ব্যর্থ হইল। তখন বাবা আদম যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত মৃত অনুচরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিলেন,—"তোমার হাতেই মরা আল্লার মরজি। কিন্তু বিধর্ম্মীর হস্তে আমার পতন হইবে না। এই লও আমার তরবারি;—আমাকে সংহার কর। অপর তরবারিতে আমাকে কিছুতেই আহত করিতে পারিবে না। আল্লার অভিশাপ যেন শীঘ্রই তোমার শিয়রে বর্ষিত হয়।" সেই তরবারি লইয়া বল্লাল সেন ফকিরকে আঘাত করিলেন। এক আঘাতেই তাঁহার দেহ দুইভাগে বিভিন্ন হইয়া গেল।

---

* এই ছিন্ন শরীরের একাংশ কোনও অদ্ভুত উপায়ে চট্টগ্রামে নীত হয়। সেখানে তাঁহার সম্মানার্থে স্থাপিত এক মস্‌জিদ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং

বল্লাল সেন শত্রুজয়ে উল্লসিত হইয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন নিমিত্ত নদীতে অবতরণ করিলেন কিন্তু নত হইয়া জলস্পর্শ করিবার সময় পারাবতটি অলক্ষিতে তাঁহার পোষাকের ভিতর হইতে উড়িয়া গেল। এদিকে রাজপরিবারবর্গ প্রাসাদপ্রাচীর হইতে উৎসুক নয়নে সংবাদের প্রতীক্ষায় চাহিয়াছিল। তাহারা সান্ধ্যগগনে উড্ডীয়মান পারাবতের শুক্র ডানাদু'টি দেখিতে পাইল। পারাবতটি উড়িয়া আসিয়া প্রাসাদ প্রাচীরে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ মধ্যে স্ত্রীলোকের করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। এবং শত্রু সৈন্য আসিয়া প্রাসাদ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই যথাশীঘ্র সম্ভব অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিল। সকলেই সেই জ্বলন্ত হুতাশনে ঝাঁপ খাইয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিল।

প্রাসাদের চতুর্দ্দিক ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এ দিকে নদীতীরে উঠিয়া বল্লাল সেনের চৈতন্য হইল; তিনি দেখিলেন পারাবতটি অতর্কিতে কখন উড়িয়া গিয়াছে। তিনি দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনি যখন প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পরিবার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আর কেহই জীবিত নাই। দুঃখে ও নৈরাশ্যে

যেখানে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, মুসলমান সম্রাট জালালুদ্দিন ফতে সার রাজত্বের সময় ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে সেখানে এক মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মস্‌জিদের অর্দ্ধাংশ বর্ত্তমানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ভগ্নাবশেষ দু'টি শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই স্তম্ভ দু'টি বল্লাল সেনের গদা বলিয়া জনশ্রুতি এখনও প্রচলিত। হিন্দু স্ত্রীলোকগণও এই মস্‌জিদের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্তম্ভ গায়ে সিন্দুর বিন্দু লেপন করে।

তিনিও সেই ধূমায়িত অগ্নিচিতায় আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন এবং পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেলেন। নিষ্ঠুর দৈবের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকাসম বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজা ভস্মীভূত হইলেন। অদ্যাবধি তিনি "পোড়া রাজা" নামেই ঐ অঞ্চলে খ্যাত।

ফকিরের অভিশাপ হাতে হাতেই ফলিয়া গেল!

প্রায়শ্চিত্ত

(১)

কলিকাতানিবাসী দামোদর চট্টোপাধ্যায়ের এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা সরমাসুন্দরী দশম বৎসরে পদার্পণ করিলে পিতামাতা কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। একে একমাত্র কন্যা, তাহার উপর আবার সে বড়ই আদরের। বিবাহের পর কন্যা শ্বশুরবাড়ী 'ঘর' করিতে যাইবে, ইহা তাঁহারা প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব অনেক যুক্তির পর ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, একটি দরিদ্র গ্রাম্য যুবার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহারা জামাতাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিয়া দিবেন। ইচ্ছা থাকিলে কার্য্যসাধনও সহজ হইয়া উঠে। বহু অন্বেষণের পর দামোদর বাবু তাঁহার গ্রামস্থ এক দরিদ্র ব্যক্তির পুত্রের সহিত তাঁহার বহুযত্নে ও আদরে লালিতা-পালিতা কন্যার যথাকালে বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

দামোদর বাবু বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক, সচ্চরিত্র, পরোপকারী ও মিষ্টভাষী। কলিকাতার কোন বিখ্যাত সওদাগরি আফিসের কেশিয়ার। সাহেবকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, "আপনিই আমাদের পিতামাতা, পালনকর্ত্তা; আপনি না দেখিলে আর কে দেখিবে?" ইত্যাদি নানাপ্রকার খোসামুদে কথায় তাহার মন ভুলাইয়া নিজের আফিসেই জামাতার এক চাকুরি করিয়া দিলেন। এবং "মেসের ভাত

খাইলে অকাল-মৃত্যু নিশ্চিত" এইরূপ ভয় দেখাইয়া জামায়ের বাসস্থান নিজ বাটীতেই নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

জামাই হরিপদ ঘরজামাই হইয়া রহিল। প্রথম প্রথম আদর-যত্ন যথেষ্টই চলিতে লাগিল। একবেলা ভাতের সহিত উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি ও রুই মাছের মুড়ো, এবং অন্যবেলা গরম ফুলকা ফুলকা লুচি ও ঘন দুধ মারিয়া ক্ষীর বড়ই উপাদেয় বোধ হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই হরিপদর ম্যালেরিয়া রোগভুক্ত জীর্ণ শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার চেহারা বেশ 'খোলতাই' মারিল। পাড়াগেঁয়ে দরিদ্রের সন্তান অর্থাভাবে মনের বাসনা সকল এতদিন তৃপ্ত করিতে পারে নাই, এখন হাতে অর্থ পড়ায়, তাহার ভোগলালসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তার উপর আবার বালাম চাল ও কলের জলের গুণ! তাহারাও বেচারীর উপর তাহাদের স্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করিতে বিমুখ হইল না। স্নানের সময় প্রত্যহ সাবান মাখা, মাথার উপর লম্বা তেড়ী কাটা, মুহুর্মুহুঃ মুখ অগ্নি করা, শনিবার শনিবার থিয়েটারে যাওয়া, বহুমূল্য পোষাকপরিচ্ছদ পরিধান করা প্রভৃতি যে সব অতৃপ্ত বাসনা তাহার হৃদয়ের নিভৃততম দেশে এতকাল লুক্কায়িত ছিল, হরিপদ ক্রমশঃ সেগুলি সব চরিতার্থ করিতে লাগিল। শনিবার রাত্রে সাবান মাখিয়া গা ধুইয়া, মাথার মাঝখানে সটান লম্বা সিঁতে কাটিয়া, মুখে সিগারেট ধরাইয়া ও হাতে ছড়ি লইয়া বাবু যখন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত শিষ্ দিতে দিতে রঙ্গালয় অভিমুখে গমন করিতেন, তখন কার সাধ্য যে তাঁহাকে আর সেই পাড়াগেঁয়ে পিলেরুগী হরিপদ বলিয়া চিনিতে পারে? মোটের উপর তিনি এখন একজন

উঁচুদরের বাবু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার অনেক মোসাহেবও জুটিয়াছে। যাহারা তাঁহাকে বিশেষভাবে চিনিত, তাহারা মাঝে মাঝে তাঁহার অলক্ষিতে বলিত,—"কাঙ্গালের বেটা লাট সাহেব!"

শ্বাশুড়ী জামায়ের এই সব পরিবর্ত্তন ও উন্নতি দেখিয়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তিনি তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিতেন। ভাবিতেন,—পরশ্রীকাতর লোক তাঁহার জামায়ের সুখে হিংসা করিতেছে। শ্বশুরেরও মাঝে মাঝে জামাইকে দু'একটা উপদেশ দিবার ইচ্ছা হইলেও স্ত্রীর ভয়ে সে ইচ্ছা তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইয়া মনের মধ্যেই লয় পাইত। হরিপদ বাবু (আমরা এবার হইতে তাঁহাকে 'বাবু' বলিয়াই ডাকিব) মাসিক যে পঁচিশ টাকা মাহিনা পাইতেন, তাহা হইতে আট টাকা দেশে দরিদ্র পিতামাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগিনীর খরচের জন্য পাঠাইতেন। এবং বাকি সতের টাকা নিজের বাবুগিরিতে ব্যয় হইত। তাও প্রতিমাসে দেশে আট টাকা পাঠাইতেন না, কোনও মাসে ছয়, কোনও মাসে বা পাঁচ। হরিপদবাবুর আর একটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি ভুলেও কখন সত্য কথা বলিতেন না। এমন কি অতি সামান্য বিষয়েও, যে ক্ষেত্রে সত্য কথা বলিলে কেহই তাঁহাকে বিন্দুমাত্র দোষ দিত না, সে ক্ষেত্রেও তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিতেন।

সরমাসুন্দরী জন্মাবধি পিতৃঅন্নে পালিত হইয়া আসিতেছে। শ্বশুরবাড়ী ঘর না করিলে স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ যেমন উদ্ধত-প্রকৃতি ও একগুঁয়ে হয়, সেও সেই রকম হইয়া উঠিল। স্বামীকে আদৌ ভক্তি করিত না, বা তাহার কথামত কোন কাজই করিত

না। বরং মধ্যে মধ্যে রাগের বশে স্বামীকে কর্কশ ও রূঢ় কথা বলিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না। নিরীহ হরিপদ বাবু "পেটে খেলে পিঠে সয়" এই প্রবাদ বাক্যটি পূর্ণমাত্রায় পালন করিয়া হাসিমুখে নির্ব্বিবাদে পত্নীর সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার বেশ স্ফূর্ত্তি চলিতেছে। সংসার চালাইবার কোন ভাবনা নাই। আগে মধ্যে মধ্যে দু'এক মাস অন্তর একবারও দেশে পিতামাতার নিকট যাইতেন, এখন তাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার পাড়াগাঁয়ে যাইতে কষ্ট হয়, সেখানকার জলবায়ু তাঁহার আর সহ্য হয় না, সেখানকার লোকেরাও সব অসভ্য চাষা! পিতামাতাকে মাসিক অর্থ সাহায্যও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। অন্নবস্ত্রের অভাবে তাঁহাদের বড়ই কষ্টে দিন চলিতে লাগিল। এমন কি অর্দ্ধাশনে বা অনশনেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দিন কাটিত। এ বিষয়ে কেহ তাঁহাকে কিছু বলিলে, তিনি উত্তর দিতেন,—"এই কাল কুড়ি টাকা পাঠিয়েছি। পঁচিশ টাকা মাহিনা, আর কত দেব? এতেও দেশে তাঁদের খরচ কুলোয় না। আমি আর কি করবো? তাদের জন্যে চুরি ডাকাতি করতে পারি না ত!"

সত্য কথা বলিতে গেলে, এখন তাঁহার নিজের খরচ অনেক বেশী বাড়িয়াছে। তিনি এক সখের দল খুলিয়াছেন, থিয়েটার করিবেন। তিনি তাহাতে রাজা সাজিবেন। ভাড়া করা দুর্গন্ধময় রাজার পোষাক তাঁহার সুন্দর শরীর আবৃত করিবে, ইহা অসহ্য! তিনি নিজের খরচে রাজার পোষাক প্রস্তুত করাইলেন। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। হরিপদবাবু আরও

নাচিয়া উঠিলেন। থিয়েটার পরিচালনের ভার সবই তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। চাঁদা অতি সামান্যই উঠিত, সব খরচই প্রায় তাঁহাকে যোগাইতে হইত। সামান্য পঁচিশ টাকা মাহিনায় আর খরচ আঁটিয়া উঠে না। দোকানে ধার চলিতে লাগিল। অনেক টাকা বাকি পড়ায় দোকানদারেরা যখন ধার বন্ধ করিয়া দিল, এবং আদালতে নালিশ করিয়া টাকা আদায়ের ভয় দেখাইল, তখন তিনি গোপনে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া টাকা ধার করিয়া থিয়েটারের দল চালাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে ছুতা করিয়া পত্নীর অলঙ্কারও বাঁধা দিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও খরচ কুলায় না। কি করেন? অর্থ চাই, অথচ কেহ আর ধার দিতে চাহিল না। আগামী শনিবার থিয়েটার হইবে। সব ঠিক ঠাক্। সকলের "পার্ট" মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, তাহারা বিশেষ সুখ্যাতির সহিত মহালাও দিয়াছে। কেবল অর্থের অভাব। বুধবার হইয়া গেল, অথচ অর্থসংগ্রহের কোনও উপায় হইল না। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। বন্ধুবান্ধবের নিকট তাহাকে অপমানিত হইতে হইবে, লজ্জায় তাঁহার মাথা কাটা গেল।

তাঁহার শ্বশুর ছিলেন, আফিসের কেশীয়ার। হরিপদবাবু শ্বশুরের সহকারীরূপে ক্যাশে কার্য্য করিতেন। তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বৃহস্পতিবার ক্যাশের দু'শত টাকা ভাঙ্গিয়া বসিলেন। ভাবিলেন যে, কেহ জানিবার পূর্ব্বেই যে কোন প্রকারে তিনি টাকা ঠিক মিলাইয়া রাখিবেন। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে! শুক্রবার ক্যাশে টাকার গোলমাল হইল। হরিপদবাবু টাকা ভাঙ্গার অপরাধে ধৃত হইলেন। সাহেব তাঁহাকে পুলিশে

ধরাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন। দামোদর বাবু অনুনয় বিনয় করিয়া সাহেবের অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া জামাতাকে জেলে যাওয়া হইতে রক্ষা করিলেন। নিজের ঘর হইতে কল্‌কলে নগদ দুইশত টাকা গুনিয়া দিয়া ক্যাশ মিলাইয়া দিলেন। হরিপদবাবু দুইশত টাকার দু'কড়া কাণাকড়িও তাঁহাকে দেখান নাই। মা দুর্গার কৃপায় হরিপদবাবু এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। শাশুড়ী পর দিনই জামায়ের শুভকামনায় সত্যনারায়ণের পূজার বন্দোবস্ত করিলেন।

(২)

হরিপদবাবুর বিবাহের পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। ছেলেটীর বয়স এখন এক বৎসর। ছেলেটীকে বাড়ীর সকলেই ভালবাসে। এখন বাবুর পসারও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। অর্থ না যোগাতে পারায়, মধু অভাবে মৌমাছির দলের ন্যায় মোসাহেবগণও একে একে সব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। শ্বশুর বাড়ীতেও সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সহৃদয় দামোদর বাবু জামাতার ব্যবহারে বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি খুব সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল বলিয়াই এতদিন জামাতার সব অন্যায় ও অত্যাচার বিনাবাক্যে সহ্য করিয়াছিলেন। এবার একেবারে অসহ্য হওয়ায়, তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিলেন।

বাজারে হরিপদ বাবুর বদনাম রটিয়া গিয়াছে। যাহারা একসময়ে তাঁহাকে "বড় বাবু", "উদার ব্যক্তি" প্রভৃতি উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়াছিল, এখন তাহারাই তাঁহাকে

"জোচ্চোর" "প্রতারক" প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিল! অর্থের এমনি মাহাত্ম্য! দেশে পিতামাতাকে অর্থাভাবে অশেষ কষ্ট দেওয়ায় সেখানেও তাঁহার মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নিজেরও মনে একটু আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। সকলের তাচ্ছিল্যভাব, পত্নীর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিয়া তুলিয়াছে। কি রকম করিয়া তাঁহার এরূপ দ্রুত অধোগতি হইল, তাহা তিনি নিজেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। চারিধারে দেনা,—রাস্তায় বাহির হওয়া দায়! চাকুরি গিয়াছে, কি উপায়ে দেনা শোধ করিবেন, তাহার ঠিক নাই। পেটে ক্ষুধা নাই; তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত ও বিমর্ষ। শরীর জীর্ণ, মুখ ম্লান। তেমন পোষাক-পরিচ্ছদের আর পারিপাট্য নাই। হরিপদ বাবু যে দীন অবস্থায় দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই একদিন শ্বশুরের কঠোর তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া দেশে মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার পকেটে একটি কপর্দ্দকও নাই! তাঁহার আর মান-অপমানের ভয়ও নাই। পিতা ইতিপূর্ব্বেই অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। মাতা হারাধনকে হাসিমুখে তাঁহার শীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। হায়, মাতৃস্নেহ কি অন্ধ! ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন জিনিস আর পৃথিবীতে কি আছে জানি না। হরিপদ বাবুর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা তাহার সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি সদয় হইল।

হরিপদ (এবার আমরা তাহাকে হরিপদই বলিব দেশেই

আছে, কোন রকমে পৈতৃক জমির ফসল হইতে নিজের ও মায়ের পেট চালাইতেছে। শ্বশুরের সহিত সে আর সাক্ষাৎ করে নাই। শ্বশুরও রাগ করিয়া তাহার কোনও সংবাদ রাখেন না। কিন্তু সরমাসুন্দরীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার অন্যায় ব্যবহার সব আজ সে বুঝিতে পারিয়াছে। পতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর যে অন্য গতি নাই, সে আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে! তীব্র বিবেক-দংশনে ব্যথিত হইয়া উষ্ণ অশ্রুধারাবর্ষণে সে দিবারাত্র তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। সে স্বামীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়াছিল, তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া একবার আসিয়া ছেলেকে দেখিয়া যাইতে। বাপের বাড়ী থকিতে তাহার আর আদৌ ইচ্ছা নাই। সে এখন বেশ বুঝিয়াছে যে, স্বামীর চরণ সেবা করিয়া অনাহারে দিন যাপন করাও পিতৃগৃহে পতিবিরহে সহস্র সুখভোগ করার অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল। নারী-জীবনের চরম উদ্দেশ্য আজ সে জানিতে পারিয়াছে। তাই আর কি স্থির থাকিতে পারে? তাহার ইহকাল ও পর-কালের একমাত্র গতি, স্বামীর চরণকমল সেবা করিবার জন্য তাহার প্রাণ আজ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন যে এ সুখভোগ হইতে সে সেচ্ছায় বঞ্চিত ছিল! প্রাণের ক্ষুধা তাই আজ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এখন আর তাহার মান অপমান জ্ঞান নাই। প্রথম পত্রের ফল কিছু হইল না দেখিয়া সে স্বামীকে পুনর্ব্বার পত্র লিখিল,—"আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দাসী বলিয়া চরণে একটু স্থান দিও। আমি সহস্র অন্যায়

করিয়াছি, আমাকে ভালবাসিতে না পার কিন্তু তোমার চরণ সেবা সুখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।”

হরিপদর মন কিছুতেই টলিল না। সে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, আর কখন অমন স্ত্রীর মুখ দর্শন করিবে না। অতি হালকাপ্রকৃতির লোকের প্রাণে যখন কোন আঘাত লাগে, তাহা এইরূপ শেলসমই বিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার মাতা বৌ ও নাতিকে আনিবার জন্য তাহাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু হরিপদ কিছুতেই সম্মত হয় নাই। মাতা বুঝিলেন ছেলের মনে বোধ হয় বড়ই আঘাত লাগিয়াছে, তাই সে নিজেকে এমন পাষাণের মত শক্ত ও নির্ম্মম করিয়া তুলিয়াছে। দয়ামায়া একেবারে তাহার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। এইভাবে আরও একবৎসর কাটিল। সরমাসুন্দরীর দুঃখের সীমা নাই। তাহার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহারা এ বিষয়ে ভুক্তভোগী, তাঁহারাই কেবল ইহা বুঝিতে পারিবেন। অনুতাপানলে তিল তিল করিয়া সে দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার সে লাবণ্য আর নাই, মুখে হাসি নাই, ভোগে ইচ্ছা নাই। তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উদ্ধত স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সে এখন দীনদপি দীন ও নম্র হইয়াছে। সে এখন স্বামীর একবিন্দু করুণাপ্রয়াসী! সে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালাইয়া ভক্তিভরে ইষ্টদেবীকে প্রণাম করে,—“মা, অবোধ সন্তানের সকল দোষ ক্ষমা কর; আমার স্বামীকে আনাইয়া দাও।” মা স্বকর্ণে তাহার প্রার্থনা শুনিলেন কিন্তু এত সহজে তাহার অন্যায় ক্ষমা করিতে রাজি হইলেন না।

সেবার কলিকাতায় কালা জ্বরের বড় বেশী প্রাদুর্ভাব হইয়া-

ছিল। অনেক শিশু হইতে প্রৌঢ় অকালে এই জ্বরের করাল কবলে পতিত হইতেছিল। একদিন রাত্রে সরমার পুত্রের ভীষণ জ্বর হইল। জ্বর ক্রমশঃই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চিকিৎসা করাইয়াও কোন সুফল হইল না। সারা দিনরাতই শিশু কেবল ভুল বকিতেছে। সরমা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে স্বামীকে আবার অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া এক পত্র দিল,—"ওগো একবার এসে বাছাকে আমার দেখে যাও। বাছা বুঝি আর বাঁচে না!" ইহাতে নিঃসম্পর্কীয় লোকের মনও বিগলিত হয়, আর পিতার কথা কি বলিব! হরিপদ আর স্থির থাকিতে পারিল না। তার বড় সাধের ছেলে আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত! সে সরল নিষ্পাপ শিশুর দোষ কি ?

হরিপদ তখন মান-অপমান সব ভুলিয়া শ্বশুর বাড়ী ছুটিয়া আসিল। শিশু তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় সুন্দর বদনমণ্ডলে কে যেন কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। যন্ত্রণার ঘোরে শিশু প্রায়ই "বাবা" "মা" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। পিতাকে সম্মুখে দেখিয়াই তাহার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বহুদিন ছাড়াছাড়ির পর সকলকে একত্র মিলিত করিয়া দিয়া একবার মাতার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিল;—তাহার অর্থ যেন,—"আমার কাজ শেষ হইয়াছে, এখন আমাকে বিদায় দাও!" অনুতপ্ত হরিপদ শ্বশুরের দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—"আমার সকল দোষ ক্ষমা করুন; আমি অবোধ। আমার পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।" দামোদর বাবু সব ভুলিয়া জামাতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"সহস্র

অপরাধ করিলেও তুমি পুত্র! কিন্তু বড় দুর্দ্দিনেই আজ আমাদের আবার মিল হইল! এ ক্ষতির পূরণ আর হইবে না।" "বাবা, বাবা! বাছা আমার! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই কি তুই অভাগীর পেটে জন্মেছিলি!" বলিয়া সরমাসুন্দরী কাঁদিয়া উঠিল।

মুমূর্ষু শিশুর মুখকমলে নির্ম্মল দিব্যহাসি ফুটিয়া উঠিল!

প্রত্যাখ্যান

গভীর নিশীথ। সংসারের অধিকাংশ জীবজন্তুই ঘুমে অচেতন। বাঙ্গালার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতিথি-সেবার জন্য বিখ্যাত। মধ্য রাত্রে গৃহদ্বারে অতিথি দণ্ডায়মান শুনিয়া তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া অতিথিকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ক্লান্তিবিনোদনার্থ বিশ্রাম করিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, ব্রাহ্মণ তাঁহার পাকের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যথাসময়ে অতিথির আহার শেষ হইয়া গেলে ব্রাহ্মণ স্বহস্তে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ধৌত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অতিথি বাধা দিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমি মুসলমান, আমার উচ্ছিষ্ট আপনি স্পর্শ করবেন না।" ব্রাহ্মণ স্মিতমুখে উত্তর করিলেন,—"আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে যে অতিথি, হিন্দুই হোক্ আর মুসলমানই হোক্, নারায়ণ স্বরূপ। আপনি অতিথি, নারায়ণ!"

আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া অতিথি বিদায়গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণের অতিথিসৎকারে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যাইবার সময় তাঁহার হাত হইতে একটি আংটি খুলিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ, এই আংটিটি তুমি রাখ; কখনও কোন বিপদে পড়লে, দিল্লীতে গিয়ে এটি দেখালেই সবাই আমাকে চিনিয়ে দেবে।" ব্রাহ্মণ ববিলেন,—"না,

অতিথিসেবার পুরস্কার স্বরূপ কিছু গ্রহণ করতে নেই। আংটি আপনি ফেরত নিন, আমি এ নিতে পারলুম না।” অতিথি বলিলেন,—“না, এ তোমার অতিথিসেবার পুরস্কার নহে। আমার আতিথ্যগ্রহণের স্মৃতিস্বরূপ এটি তোমার কাছে রাখ।” ব্রাহ্মণ এ প্রস্তাবে আর অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না। অতিথি প্রস্থান করিলে ব্রাহ্মণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, আংটির উপর অবোধ্য ভাষায় দু'চার কথা কি লেখা রহিয়াছে। তিনি সেটি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলেন।

* * * *

কথিত আছে, বাঙ্গালা প্রদেশ জয় করিবার পর সম্রাট আকবর শাহ্ প্রজাগণের অবস্থা সম্যক অবগত হইবার জন্য বাগদাদের খালিফ্ হারুণ-অল-রসিদের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাত্রে গ্রামের ভিতর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের অতিথিসৎকার গুণের কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই তাঁহার কুটীর-দ্বারে অতিথির বেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দু'এক বৎসর পরে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িল। ক্রমে দুইবেলা অন্ন জুটাও ভার হইয়া উঠিল। একদিন ব্রাহ্মণী বলিলেন,—“দেখ, একটা কাজ করলে হয় না। আর কতদিন এমন করে উপবাস যাবে! সেই মুসলমান অতিথির সন্ধানে একবার গেলে হয় না? তিনি ত বলে গেছলেন, দিল্লীতে গিয়ে কাউকে সে আংটিটা দেখালেই তাঁর পরিচয় পাবে। তিনি এ বিপদে আমাদের একটা কিছু উপায় করে দিতে পারবেন বোধ হয়।”

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এ যুক্তি মন্দ নহে, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি। পেটরা হইতে আংটিটি বাহির করিয়া তাহা সঙ্গে লইয়া তিনি দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে গিয়া নগরের ভিতর প্রবেশ করিতেই একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি সম্রাটের দরবারের একজন প্রধান ওমরাহ। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আংটি দেখাইতেই তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন,—"একি, এ যে সম্রাটের নামাঙ্কিত তাঁহার খাস আংটি! ব্রাহ্মণ, এ আংটি তুমি কোথায় পেলে?" সম্রাটের নাম শুনিয়াই ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন, তিনি কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"দেখ বাবা, এক মুসলমান অতিথি আমার বাড়ীতে এ আংটিটি আমাকে উপহার দেন, বলেছিলেন বিপদে পড়লে দিল্লীতে এসে কা'কেও দেখালেই তাঁ'র পরিচয় পাব। সম্রাটের নামাঙ্কিত কি না, তা ত আমি বলতে পারি না!"

ওমরাহ প্রথম মনে মনে ভাবিলেন হয় ত এ আংটি ব্রাহ্মণ চুরি করিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহার মনে হইল, ব্রাহ্মণ যাহা বলিল, তাহা সত্য হইতেও পারে, আকবরের লীলা বুঝা ভার! তিনি তখন প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"আচ্ছা আমার সঙ্গে চল, আমি তাঁ'কে দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া এক মসজিদের সম্মুখে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সে দিন শুক্রবার, সম্রাট মসজিদের ভিতর নেমাজ পড়িতেছিলেন। ওমরাহ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। সম্রাট নেমাজ পড়ছেন; মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেই তাঁ'কে আংটি দেখিও।"

ব্রাহ্মণ মসজিদের উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া ভিতরে সম্রাটকে

নেমাজ পড়িতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সে রাত্রের অতিথি বলিয়া ব্রাহ্মণ চিনিতে পারিলেন। তিনি এক দৃষ্টিতে সম্রাটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছু পরে সম্রাট নেমাজপড়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া সম্রাট হাসিমুখে সাদরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন,—"দয়া করে যখন এসেছেন, চলুন, আজ আপনাকে আমার বাড়ী অতিথি হ'তে হবে। পরে আপনার কথা সব শুনবো।"

ব্রাহ্মণ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"না, আপনার বাড়ী আর যাব না। আপনার কাছে আর আমার কোন দরকার নেই। আমি এসেছিলাম বটে, আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা করবার জন্যে, কিন্তু সে ইচ্ছা এখন আমার দূর হয়েছে। আপনি যখন নেমাজ পড়ছিলেন, আপনি ত তদ্গতচিত্তে ভগবানকে ডাকেন নি! আপনি কেবল তাঁকে বলছিলেন,—'আমার মেয়ের বড় অসুখ করেছে, তা'কে ভাল করে দাও, আমাকে ধন দাও, যশস্বী কর।' তা দিল্লীসম্রাট হয়ে আপনার যখন এত অভাব, তখন আমার অভাব আপনি দূর করবেন কি করে? কিছু মনে করবেন না। আমি চল্লাম।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আকবর শাহ নির্ব্বাক হইয়া একদৃষ্টিতে সেই অদ্ভুত ব্রাহ্মণের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কি অদ্ভুত শক্তি! ব্রাহ্মণ যা বল্লেন, তা'ত সবই সত্য! আমি ত যথার্থ ই আমার মেয়ের অসুখের কথাই ভাবছিলাম, ঈশ্বরকে ত ডাকি নি!"

ডাক্তার সাহেব

(১)

রায় সাহেব বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বালিগঞ্জে প্র্যাকটিস্ চালাইবেন স্থির করিয়া সেখানে একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন। তাঁহার দেশ কোথায়, তাঁহার বংশ-পরিচয় কি, এ অঞ্চলের কেহই তাহা অবগত ছিল না। তিনি নিজে কখনও কাহাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই। প্রতিবেশীরাও সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু প্রশ্ন করা ভদ্রতাসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে নাই।

প্রথম প্রথম নূতন পাশ করা ডাক্তারের ভাগ্যে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে—নৈরাশ্য ও বিদ্রূপ লাভ, রায় সাহেবও তাহা হইতে নিস্তার পান নাই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার পশার বেশ জমিয়া উঠিতে লাগিল। স্থানীয় একজন ধনী জমিদারকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করায় বালিগঞ্জে তাঁহার নামডাক খুব বাড়িয়া গেল। তিনি ঐ অঞ্চলের বহুদিনের পুরাতন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। পরন্তু তাঁহার সুন্দর আকৃতি, ভদ্র ব্যবহার এবং মিষ্ট আলাপের গুণে স্থানীয় সকলেরই তিনি বিশেষ প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং ব্যবসাক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বন্ধুরা ও রোগীরা কেবল একটি বিষয়ে তাঁহার দোষ লক্ষ্য করিত, ডাক্তার সাহেব অদ্যাবধি অবিবাহিত।

তাঁহার আর্থিক অবস্থা ত বেশ সচ্ছল, অথচ বিবাহ না করিবার কারণ কেহই উপলব্ধি করিতে পারিত না। প্রথম প্রথম অনেকে ভাবিত, এবার ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন, কিন্তু বৎসর শেষ হইয়া গেল অথচ তাহাদের আশা পূর্ণ না হওয়ায় সকলেই স্থির করিল, ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে। কিন্তু অনেকে অনেক মাথা ঘামাইয়াও সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিল না। তাহারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিফল হইলে, একদিন হঠাৎ পাড়ায় রাষ্ট হইল যে ইঞ্জিনীয়ার যামিনী মিত্রের ভগিনী ললিতার সহিত ডাক্তার সাহেবের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

ললিতার পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বেই তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিলাত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার মিত্রসাহেব এখন পিতার অগাধ ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া নিজের ব্যবসা চালাইতেছেন। ললিতাকে তিনি বড়ই স্নেহ ও আদর করিতেন। ললিতারও রূপ-গুণের প্রশংসা পাড়ার সকলেই করিত। কোনও সান্ধ্য সম্মিলনে ডাক্তার সাহেবের সহিত ললিতার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তাহাই ক্রমে ঘনিষ্ট সদ্ভাবে পরিণত হয়। দু'জনে পরস্পরের প্রতি খুব আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈশাখ মাসেই বিবাহের কথাবার্ত্তা সব পাকা হয় এবং আষাঢ়ের মধ্যভাগেই বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল।

জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই ডাক্তার সাহেব কি এক পত্র পাইয়া বিষণ্ণ বদনে মিত্র সাহেবের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ললিতার সহিত নিভৃতে দেখা করিয়া প্রায় একঘণ্টা তাঁহার সহিত কথা কহিলেন। দু'চার দিনের মধ্যেই পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে ডাক্তার সাহেব আর ললিতাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহেন। তাঁহার এই অভদ্র আচরণে সকলেই তাঁহার উপর রাগান্বিত হইলেন। ললিতার দাদা মিত্র সাহেব ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া দু'চার জনের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে, এ অপমানের প্রতিশোধ তিনি নিশ্চয়ই লইবেন। ললিতাকে ডাক্তার সাহেবের উপর রাগ করিতে কেহ কখনও শুনে নাই বটে, কিন্তু তদবধি কেহ আর তাহার মুখে হাসি লক্ষ্য করে নাই। নিষ্কর্ম্মা লোকেরা এই ব্যাপার লইয়া নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী পাড়ায় অনেক কুৎসা রটাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর লোকজনের মধ্যে একজন বাবুর্চ্চি ও দু'জন চাকর। রাত্রে চাকরবাকরেরা ঘুমাইয়া পড়িলেও তিনি তাঁহার পাঠাগারে প্রত্যহই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বই পড়িতেন। এই পাঠাগারের একটি দরজা বাগানের দিকে ছিল। বেশী রাত্রে কোনও লোক ডাকিতে আসিলে এই দরজায় ধাক্কা মারিত। চাকরবাকরেরা ঘুমাইয়া পড়িলেও তাহা-দের ঘুমের আদৌ ব্যাঘাত হইত না; তাহারা এ সম্বন্ধে কিছুই টের পাইত না।

সে দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের ১২ই তারিখ, রাত্রি প্রায় দশটার সময় রামনিধি চাকর বাড়ীর কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া পাঠাগারে ঢুকিয়া দেখিল ডাক্তারসাহেব তাঁহার চিরাভ্যস্ত প্রথানুযায়ী আরাম কেদারায় শুইয়া বই পড়িতেছেন। সে আর কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে ঘুমাইতে গেল। কিন্তু, অর্দ্ধঘণ্টা পরেই

বাড়ীর ভিতর হইতে একটা চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাইল। সে কিছুক্ষণ বিছানার উপর উঠিয়া অপেক্ষা করিল, কিন্তু সেরূপ শব্দ আর দ্বিতীয়বার শুনিতে পাইল না। তখন তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মনিবের পাঠাগারের নিকট আসিল। দেখিল ভিতরের দিকের দরজা ও জানালা সবই বন্ধ। তখন সে দরজায় জোরে ধাক্কা মারিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল, "দরজায় ধাক্কা মারে কে?"

"আজ্ঞে, আমি রামনিধি।"

"এত রাত্রে এখানে কেন? যা তোর ঘরে শুগে যা।" ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল। কিন্তু সে স্বর তাহার মনিবের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর হইতে একটু যেন পৃথক্ বলিয়া তাহার বোধ হইল। সে বাহির হইতে উত্তর করিল,—"আমার মনে হল আপনি বুঝি আমাকে ডাকছেন।" এ কথার আর কোনও উত্তর আসিল না। রামনিধিও আর অপেক্ষা না করিয়া নিজের ঘরে শুইতে গেল। কিন্তু তাহার মনে কি রকম একটা খট্‌কা রহিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় রামবাবু ডাক্তার সাহেবকে ডাকিবার জন্য তাঁহার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী সাজ্ঘাতিক ভাবে পীড়িত। রাত্রে স্ত্রীর অবস্থা খারাপ হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিবার জন্য ডাক্তার সাহেব রামবাবুকে বলিয়া আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর ফটক পার হইবামাত্র রামবাবু দেখিলেন ইঞ্জিনীয়ার মিত্র সাহেব বাহির হইয়া আসিতেছেন। গ্যাসের আলোতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন মিত্র সাহেবের মুখের ভাব বড়ই উত্তেজিত এবং তাঁহার

হাতে একটা মোটা লাঠি। রামবাবুকে বাড়ীর ফটকের ভিতর ঢুকিতে দেখিয়া মিত্র সাহেব বলিয়া উঠিলেন,—"ডাক্তার সাহেব বাড়ী নেই মশাই।"

"আপনি কেমন করে জানলেন?"

"আমি এইমাত্র ডেকে ফিরে আসছি। সাড়া শব্দ পেলাম না।"

"তাঁর পাঠাগারে ঐ যে আলো জ্বলছে দেখতে পাচ্ছি।"

"আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু তিনি ওখানে নেই।"

"নিশ্চয়ই শীঘ্রি বাড়ী ফিরবেন। তাহলে একটু অপেক্ষা করি গে।"

এই বলিয়া রামবাবু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া মিত্র সাহেবও স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

রামবাবু ডাক্তারের পাঠাগারের নিকট আসিয়া ভিতরে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। তিনি দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা মারিলেন কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যখন বিফল হইলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে ঘরের ভিতর এরূপ আলো জ্বালাইয়া ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই বাহিরে বা শয়নকক্ষে যান নাই। বোধ হয় বই পড়িতে পড়িতেই কেদারার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। পরে তিনি জানালার উপর উঠিয়া ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলেন।

টেবিলের উপর একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছে। আলোর জোরে ঘরটি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের উপর ডাক্তার সাহেবের পুস্তক ও কাগজপত্র ছড়ান রহিয়াছে। ঘরের ভিতর কোন লোকই নাই, কেবল মেজেতে সতরঞ্চির উপর কি একটা লম্বা সাদা জিনিষ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথম দর্শনে উহা বস্ত্রখণ্ড

বলিয়াই রামবাবুর মনে হইল, কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে উহা মেজের উপর শায়িত কোনও মনুষ্যের হস্ত। ভয়ে তাঁহার সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। তাঁহার সন্দেহ হইল নিশ্চয়ই ঘরের ভিতরে কিছু সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া চাকরদের ডাকাই-লেন এবং একজনকে থানায় খবর দিতে পাঠাইয়া অপরকে সঙ্গে লইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

জানালা হইতে একটু দূরে টেবিলের পাশেই ডাক্তার সাহেবের অসাড় দেহ মেজের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। শেষ প্রাণবায়ু বহুপূর্ব্বেই নির্গত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার একটা চোখ কাণা হইয়া গিয়াছে এবং মুখে ও ঘাড়ে আঘাতের দাগ রহিয়াছে; নিশ্চয়ই কেহ তাঁহাকে গুরুতর প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার গায়ে একটা সাদা সার্ট ও পায়ে চটি জুতা। জুতার তলা একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সতরঞ্জির উপর জুতার তলার কাদার দাগ রহিয়াছে। ইহা যে হত্যাকারীরই পদচিহ্ন তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল। হত্যাকারী নিশ্চয়ই পাঠাগারের ভিতর ঢুকিয়া ডাক্তারকে হত্যা করিয়া অলক্ষিতে পলাইয়া গিয়াছে। এই সব নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া পুলিসের লোক স্থির করিল যে হত্যাকারী নিশ্চয়ই পুরুষ মানুষ কিন্তু তাহার বেশী তাহারা আর কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না।

ঘরের ভিতরের কোন জিনিষই চুরি যায় নাই। টেবিলের উপর ডাক্তারের সোনার ঘড়িটি ঠিক রহিয়াছে। আলমারির ভিতর তাঁহার ক্যাশ বাক্স ছিল, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাতে ঠিক চাবি দেওয়া আছে। এ ক্ষেত্রে রামবাবুর কথা মত

কেবল একজনের উপরই সন্দেহ হইতে পারে, তিনি হচ্ছেন ইঞ্জিনীয়ার যামিনী মিত্র। অনতিবিলম্বে পুলিস তাহাকেই হত্যাপরাধে ধৃত করিল।

(২)

সমস্ত সহরে একটা মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেবের জন্মভূমি বা পূর্ব্বপুরুষগণের নাম-ধাম কেহই জানে না। এই অপরিচিত ব্যক্তির এরূপ করুণ জীবনাবসান এবং একজন উচ্চ-পদস্থ ইঞ্জিনীয়ারের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। বিচারের দিন আদালত-ঘর নানা লোকে পরিপূর্ণ হইল। সরকারী ব্যারিষ্টার প্রথম তাহাদের মামলা বেশ গুছাইয়া বলিলেন। তাহাদের সাক্ষীগণেরও সাক্ষ্য লওয়া হইল। নিম্নে সেই সবের সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইল।

আসামী তাহার ভগিনী ললিতাকে বড়ই ভাল বাসিত। ডাক্তার সাহেবের সহিত ললিতার বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে যে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিল এবং এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা যে লোক সম্মুখে অনেকবার প্রকাশও করিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে জনকতক লোক সাক্ষ্য দিল। পরে রামবাবুর সাক্ষ্যই আসামীর বিরুদ্ধে বড় জোর হইয়াছিল। তিনি রাত্রি প্রায় এগারটার সময় তাঁহার স্ত্রীর অসুখের জন্য ডাক্তার সাহেবকে ডাকিতে আসেন, তখন তিনি আসামীকে ডাক্তারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছিলেন। আসামীর মুখের ভাব উত্তেজিত, তাহার হাতে একটা মোটা লাঠি ছিল। ডাক্তার সাহেব বাড়ী নাই বলিয়া সে রামবাবুকে ফিরিয়া যাইতে বলে, কিন্তু তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন থাকায় তিনি অপেক্ষা করিতেই

স্থির করেন। তাহার পরই রামবাবু গিয়া দেখেন ঘরের মেঝের উপর ডাক্তারের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

ভৃত্য রামনিধিও সাক্ষ্য দিল যে, রাত্রি ঠিক তখন কয়টা তাহা সে বলিতে পারিবে না, তবে দশটা বা এগারটার সময় সে একটা কাতর চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া মনিবের পাঠাগারে আসিয়া দরজায় ধাক্কা দেয়, কিন্তু ভিতর হইতে কে তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিল। সে কণ্ঠস্বর তাহার মনিবের সাধারণ স্বর হইতে যেন একটু পৃথক্ বলিয়াই তখন তাহার মনে হইয়াছিল। তাহার কিছু পরেই—প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হইবে, রামবাবুর চীৎকারে সে জাগিয়া উঠে। আসামীর এক চাকরকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি এগারটার পর তাহার মনিব বাড়ী ফিরিয়া আসেন। একজন সাক্ষ্য দিল, ডাক্তার সাহেব যে অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত পাঠাগারে জাগিয়া বই পড়িতেন, তাহা আসামী জানিত এবং সেই জন্যেই ঐ সময় সুবিধাজনক ভাবিয়া সে ডাক্তার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করে। ঘরের সতরঞ্চির উপর জুতার দাগ সম্বন্ধে পুলিসের লোক সাক্ষ্য দিল যে, হত্যাকাণ্ডের পরদিন প্রাতেই সে আসামীর বাড়ী খানাতল্লাস করিতে গিয়া গত রাত্রে যে জুতা পায়ে দিয়া সে বাহির হইয়াছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল, জুতার তলা কর্দ্দমাক্ত এবং সতরঞ্চির উপর কাদার দাগগুলো আসামীরই জুতার তলার দাগের মতন বলিয়া তাহার মনে হয়। সরকারী পক্ষের মামলা ইহাতেই শেষ।

ব্যাপার দাঁড়াইল এইরূপ যে, আসামীই ডাক্তারের বাড়ী

আসিয়া পাঠাগারে প্রবেশ করে এবং তাঁহাকে গুরুতর প্রহার করে। তাহাতেই ডাক্তার সাহেবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যন্ত্রণায় কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন, তাহা শুনিয়াই রামনিধি ছুটিয়া আসে। আসামীই তখন মৃত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করে। পরে হত্যা করিয়া চলিয়া যাইবার সময় রামবাবুর সহিত আসামীর সাক্ষাৎ হয় এবং ডাক্তার সাহেব বাড়ী নাই বলিয়া তাঁহাকে সে ভাগাইয়া দিবার চেষ্টা করে। শ্রোতৃবৃন্দ এই সব শুনিয়া স্থির করিল যে, আসামীর বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু এই সব অভিযোগ খণ্ডন করা তাহার পক্ষের ব্যারিষ্টারের বড়ই দুরূহ হইবে।

পক্ষান্তরে এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আসামীর জবাব, মিত্র সাহেব একটু তেজী ও উদ্ধত হইলেও, তাঁহার সরলতার জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। তিনি যে এরূপ একটা গর্হিত কাজ করিতে পারেন, তাহা কাহারও বিশ্বাস করা উচিত নহে। অবশ্য সাংসারিক কোনও ঘটনার আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ডাক্তারের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন,—ডাক্তারের সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধের কথা তিনি আদৌ উল্লেখ করেন নাই,—কিন্তু ডাক্তারের সহিত আলোচনার প্রসঙ্গটা যে প্রীতিকর ছিল না, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় তিনি ডাক্তার সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসেন। কিন্তু পাঠাগারের দরজায় জোরে ধাক্কা মারিয়াও কাহার কিছু সাড়াশব্দ পান নাই। তখন বাড়ী ফিরিবার সময় ডাক্তার সাহেবের

ফটকের কাছে রামবাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ডাক্তার সাহেব বাড়ী নাই ভাবিয়াই সরল অন্তঃকরণেই তিনি রামবাবুকে সে সংবাদ দেন। তাঁহার মনে অন্য কোনও কুভাব ছিল না। তিনি সোজা বাড়ী ফিরিয়া আসেন। ডাক্তারের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না।

পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু পরে বিশেষ কোনও কারণবশতঃ, তাহা তিনি উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করেন না,—তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। সেই বিষয়ই ভাবিতে ছিলেন বলিয়া তখন তাঁহার মুখের ভাব একটু গম্ভীর দেখাইতে পারে। প্রত্যহই সন্ধ্যায় বাহির হইবার সময় তিনি ঐ মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাহির হন। ডাক্তার সাহেবের উপর তাঁহার সবিশেষ ক্রোধ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল বটে, এবং তাহারই বশীভূত হইয়া তিনি অপমানের প্রতিশোধ লইবার অভিমত লোকসমক্ষে প্রকাশও করিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ ভাবে প্রতিশোধ লইবার কথা তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। পরন্তু রামনিধি যে রাত্রে কখন তাহার মৃত মনিবের কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহা সে ঠিক বলিতে পারে না। তাহার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রামবাবুর চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া তাহার পুনর্ব্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় ডাক্তার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এগারটার সময় ডাক্তার সাহেবকে ডাকিতে আসিয়া দেখা পান নাই; রামবাবুও বলিয়াছেন প্রায় এগারটার সময়ই তাঁহার সহিত আসামীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি যে ডাক্তারকে হত্যা করিয়া আধ ঘণ্টা ঘরের ভিতর বসিয়াছিলেন, ইহা আদৌ

সম্ভব নহে। জুতার দাগের সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই সে দিন সন্ধ্যার পর খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য যাহারাই সে রাত্রে পথে বাহির হইয়াছিল, তাহাদেরই জুতার তলা কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছিল। আর সমবয়স্কদের জুতার তলার দাগ প্রায় সবই এক রকমের।

মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া হাসপাতালের ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি বহুদিন হইতেই হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন, তাঁহার ফুস্‌ফুস্‌ খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্যই আঘাতটা সাধারণ সবল ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর না হইলেও তাঁহার মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের যে কখনও হৃদ্‌রোগ ছিল, তাহা পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

এবার আসামীর পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়া আরম্ভ হইল। প্রথমেই আসামীর ভগিনী ললিতাকে সাক্ষীর কাঠ্‌গড়ায় উঠিতে দেখিয়া উপস্থিত জন-সাধারণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইঁহারই সহিত ডাক্তার সাহেবের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল এবং সেই সম্বন্ধ ডাক্তারের প্রস্তাবে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আসামীই যে ডাক্তারকে হত্যা করিয়াছে, ইহাই পুলিশের মোকদ্দমা। কিন্তু পুলিশ ললিতাকে ইহার মধ্যে কোনও বিষয়ে জড়ায় নাই।

ললিতা ধীরে ধীরে অথচ স্পষ্টভাবে নিজের বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সবাই বুঝিতে পারিল যে, তিনি একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সংক্ষেপে ডাক্তার

সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধের কথা বলিলেন কিন্তু কি কারণ বশতঃ উহা ভাঙ্গিয়া যায়, সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা ভিতরের কথা সব না বুঝিয়া বৃথা ডাক্তারের উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রায়ই বলিতেন যে, এ অপমানের তিনি যথাসাধ্য প্রতিশোধ লইবেন। ভ্রাতার রাগ নরম করিবার জন্য ললিতা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই দুর্ঘটনা ঘটিবার দিন সন্ধ্যাতেও তিনি আসামীকে ডাক্তার সাহেবের প্রতি ভীষণ রাগ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলেন।

ললিতার এই পর্য্যন্ত বক্তব্য শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল,—একি, ইনি যে এক প্রকার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছেন! কিন্তু আসামীর ব্যারিষ্টার তাঁহাকে পরবর্ত্তী যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরেই আসল কথা সব বাহির হইয়া পড়িল। সে কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

আসামীর ব্যারিষ্টার ললিতাকে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার কি বিশ্বাস হয় যে আপনার দাদা এ হত্যাব্যাপারে লিপ্ত?"

জজসাহেব এ প্রশ্ন শুনিয়া এজলাস্ হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি সাক্ষীকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দিতে পারি না। আমরা এখানে সত্যাসত্য ঘটনার বিচার করতে এসেছি, কার কি বিশ্বাস, তাতে আমাদের দরকার নেই।" "আচ্ছা বেশ, আমি অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি,—আসামী এ কাজ করেছে কিনা, আপনি জানেন?"

"হাঁ জানি, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

"আপনি কি রকম করে তা জানলেন?"

"কারণ ডাক্তার সাহেব এখনও জীবিত আছেন।"

এ উত্তর শুনিয়া সমস্ত আদালত ঘরের মধ্যে একটা উত্তেজনার স্রোত বহিয়া গেল। ব্যারিষ্টার সাহেব কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি রকমে জানলেন যে, ডাক্তার সাহেব এখনও বেঁচে আছেন?"

"তিনি যে তারিখে মারা গেছেন বলে আপনারা ঠিক করেছেন, তার পরের তারিখে লেখা চিঠি তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি।"

"সে চিঠি আপনার নিকট আছে?"

"হাঁ আছে, কিন্তু সে চিঠি আমি আদালতে দেখাতে ইচ্ছা করি না।"

"চিঠির খামখানা আছে?"

"হাঁ, এই যে।"

"কোন পোষ্ট আফিসের ছাপ?"

"লাহোরের।"

"তারিখ?"

"১৪ই জ্যৈষ্ঠ।"

"আপনি হলপ করে বলছেন যে এ হাতের লেখা ডাক্তার সাহেবের?"

"নিশ্চয়ই।"

সরকারী পক্ষের ব্যারিষ্টার তখন তাঁহাকে জেরা করিতে উঠিলেন,—"পুলিশে যখন হত্যাকাণ্ড তদন্ত করে, তারপর আপনি এ পত্র পান?"

"হাঁ।"

"আপনি সেটা তাহলে পুলিশের নিকট দেখান নি কেন? তাহলে ব্যাপার এতদূর গড়াত না!"

"ডাক্তার সাহেব অনুরোধ করেছিলেন চিঠিখানা গোপন রাখতে।"

"তবে আজ আপনি সে কথা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করলেন কেন?"

"দাদাকে রক্ষা করবার জন্যে।"

এইখানেই তাঁহার সাক্ষ্য শেষ হইল। সরকারি ব্যারিষ্টার তখন চিঠির খামটা আদালতে দাখিল করিতে প্রার্থনা করিলেন। তিনি হাতের লেখা পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আনাইয়া প্রমাণ করাইয়া দিবেন যে, এটি সম্পূর্ণ জাল। আসামীকে বাঁচাইবার জন্য এই মিথ্যা প্রমাণ গঠিত হইয়াছে। ডক্তার সাহেবের বন্ধুরা ও রোগীরা তাঁহার মৃতদেহ সনাক্ত করিয়াছে।

তখন আসামীর পক্ষের ব্যারিষ্টার জজকে বলিলেন,—"আমি আর জনকতক সাক্ষী ডাক্‌তে চাই, তারা ডাক্তার সাহেবের হাতের লেখা সনাক্ত করবে।"

জজ সাহেব উত্তর করিলেন,—"আজ আর নয়। কাল আপনার সাক্ষীদের আনবেন। কেবল ডাক্তারের হাতের লেখা সনাক্ত করলেই হবে না, তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে এই মৃতদেহ কার সে বিষয়েও আপনাকে সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে হবে। আজ এই পর্য্যন্ত।"

আসামীর ভগিনীর সাক্ষ্য লইয়া দেশময় একটা সরগোল পড়িয়া গেল। তাহার সাক্ষ্য কতদূর সত্য, এই লইয়া সকলে আলোচনা করিতে লাগিল আর ডাক্তার সাহেব যদি যথার্থই

বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পাঠাগারে যে ব্যক্তির মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে ডাক্তার সাহেবই তাহ'লে খুব সম্ভবতঃ তাহাকে খুন করিয়া গা ঢাকা দিয়াছেন। মৃতব্যক্তি দেখিতেও কি ঠিক ডাক্তার সাহেবের মতন! ললিতা ডাক্তার সাহেবের চিঠিখানি আদালতে দাখিল করিতে অসম্মত হইতেছেন। তাহার কারণ বোধ হয়, সে পত্রে ডাক্তার সাহেব তাঁহার নিকট নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছেন। সে পত্র দাখিল করিয়া ভাইকে বাঁচাইতে গেলে, ডাক্তার সাহেবকে ফাঁসিকাষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হয়।

(৩)

পরদিন বিচারালয় দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার মহা ব্যস্ততার সহিত ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি একজন প্রবীণ আইন-ব্যবসায়ী ; এতদিন কোন মোকদ্দমাতে তাঁহাকে এরূপ বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই বিপক্ষের ব্যারিষ্টারের সহিত কি গুজ্-গুজ্ করিলেন! তাহার ফলে উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করিল যে তাঁহার মুখেও একটা বিস্ময়ের রেখাপাত হইল।

আসামীর ব্যারিষ্টার জজসাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হুজুর, কাল আমি যাদের সাক্ষী দেব বলেছিলুম, আজ আর তাদের ডাকতে ইচ্ছা করি না।"

জজ সাহেব উত্তর করিলেন,—"কিন্তু কাল আপনার সাক্ষী যা বলে গেছেন, তাতে ত প্রমাণের ভার সব আপনার উপরই।"

"আমার পরবর্তী সাক্ষী এ বিষয়ে চূড়ান্ত সাক্ষ্য দেবে।"

"তাকে ডাকুন।"

"আমি ডাক্তার রায় সাহেবকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"—তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন। ইনি অনেক মকোদ্দমায় আশ্চর্য্য কথা বলিয়া বিপক্ষের উকিল ব্যারিষ্টার, হাকিম ও মামলাবাজগণকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এত অল্প কথায় এরূপ কৌতূহল ও বিস্ময় কখনও উৎপন্ন করিতে পারেন নাই।

ডাক্তার সাহেব, যাঁহাকে মৃত বলিয়া সকলের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, তাঁহাকে স্বশরীরে সাক্ষীর কাঠ্‌গড়ায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহাদের মুখ দিয়া আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। পূর্ব্বের অপেক্ষা ডাক্তার সাহেবের শরীর একটু রোগা হইয়া গিয়াছে, তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট। জজকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন,—

"আমি কোনও কথা আপনাদের নিকট গোপন করবো না, সে রাত্রে যা ঘটেছিল, তা যথাযথ বলে যাবো। আমি যদি ঘুণাক্ষরেও পূর্ব্বে টের পেতুম যে আমারই দোষে নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ যাদের আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি, তারা বিপদে পড়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই এতদিন এখানে এসে হাজির হতুম। কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নি।

"আমার পিতা পশ্চিমে ব্যবসা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই খারাপ হয়। আমার যমজ ভাই সরোজনাথ, আকারে প্রকারে ঠিক আমারই মতন দেখতে ছিল। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকলে, খুব নিকট আত্মীয়ও আমাদের পৃথক করতে গোলে পড়তো। আমি

বিলাত থেকে ডাক্তারি পাশ করে ফিরে আসবার পূর্ব্বেই আমার পিতা মারা যান। বাড়ী এসে দেখি, আমার একমাত্র ভাই সরোজ সঙ্গদোষে পড়ে, তার স্বভাব চরিত্র একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে। আমাদের চেহারার সাদৃশ্যের জন্য আমি এমন বিপদে পড়লুম যে, সে কোনও অন্যায় কাজ করলে, লোকে প্রায়ই আমাকে সন্দেহ করে বসতো। তাকে সৎপথে আনবার জন্যে ঢের চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কোনও ফল হয় নি। সে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে। এমন কি একটা অতীব গর্হিত কাজ করে নিজেই আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সকলকে বলে বেড়াতে লাগলো। আমার প্রাণে ধিক্কার জন্মিল। আমি তখন দেশ ত্যাগ করে বালিগঞ্জে ডাক্তারি করবার উদ্দেশ্যে এসে উপস্থিত হই।

"ভেবেছিলুম এখানে সে আর সন্ধান নিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না। এত দিন বেশ মনের শান্তিতে ছিলুম। কিন্তু জানি না এত দিন পরে কি রকমে সন্ধান পেয়ে আমাকে এখানে সে এক পত্র দিল যে, অর্থের অভাবে তার বড়ই কষ্টে দিন যাচ্ছে। শীঘ্রই সে বালিগঞ্জে চলে আসছে। চিঠি পেয়েই ভয়ে আমার দেহ শিউরে উঠলো। যখন এখানকার সন্ধান সে পেয়েছে, তখন নিশ্চয়ই এখানেও আমাকে জ্বালাতন করতে আসবে। তখন মিত্রসাহেবের ভগিনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গেছলো ; কিন্তু ভাবলুম সরোজ এখানে এলে নিশ্চয়ই আমার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অভদ্র ও অন্যায় ব্যবহার করবে। এই ভয়েই তাদের কোনও রকমে বিপদ থেকে দূরে রাখবার জন্যেই আমি বিবাহের সম্বন্ধ

ভেঙ্গে দিই। কিন্তু মিত্র সাহেব ভেতরের কথা সব না বুঝে বৃথা আমার উপর সন্দেহ করে রাগান্বিত হন। আমার নিজের কষ্ট যতই হোক, যাদের আমি ভালবাসি, আমার জন্যে তাদের কোনও কষ্ট ভোগ করতে না হয়, এই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

"চিঠি পাবার দু'চার দিন পরেই একদিন রাত্রে ভাই আমার স্বশরীরে এসে উপস্থিত হন। চাকর বাকরেরা কেউ জেগে ছিল না। আমি একলা পাঠাগারে পড়ছিলুম। রাত্রি তখন দশটা বেজে গেছে। সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঘরের ভেতর তাকালো। আমাদের চেহারার সাদৃশ্য এত বেশী যে তখন মনে হল যেন আরসিতে নিজেরই মুখ দেখছি। আমি তাকে দেখেই আতঙ্কে শিউরে উঠলুম। এই ভায়ের দুর্ব্যবহারেই দেশ ত্যাগ করে আমাকে চলে আসতে হয়। ইনিই আমাদের নির্ম্মল কুলে কালি ঢেলে দিয়েছেন! যাহোক দরজা খুলে দিয়ে তাকে ভেতরে আসতে বল্লুম।

"কাছে আসতেই তার চেহারার উপর আমার নজর পড়লো। দেখেই বুঝতে পারলুম দেহের ভেতর তার নিশ্চয়ই কোন খারাপ রোগ জন্মেছে। তার পোষাক পরিচ্ছদ মলিন ও ছিন্ন। এ থেকেই তার আর্থিক অবস্থা আমার সম্যক উপলব্ধি হল। মুখ দিয়ে ভর ভর করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। তার চোখের কোণে কালসিটে পড়েছে, মুখে ও ঘাড়ে প্রহারের দাগ রয়েছে। বোধ হল মাতাল অবস্থায় সম্প্রতি রাস্তায় মারামারি করে এসেছে। এসেই আমার উপর তম্বি-তাম্বা করতে লাগলো। আমি টাকার উপর শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছি,

আর সে অর্থাভাবে কোনও দিন আধ পেটা, কোনও দিন অনাহারে দিন যাপন করেছে! বন্য পশুর মত ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে অভদ্র ভাষায় কেবল টাকার তাগাদা করতে লাগলো। আমি অনেক কষ্টে নিজকে সংযত করে রেখেছিলুম। আমি যতই চুপ করে থাকি, তার রাগের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে। সে চীৎকার করতে লাগল, আমাকে পুনঃপুনঃ অভদ্রভাষায় গালি দিল, মুখের কাছে ঘুষি পাকিয়ে হাত নাড়তে লাগলো, ইচ্ছে যেন দু'ঘা বসিয়ে দেয়। হঠাৎ তার সারা দেহ থরথর করে কেঁপে উঠলো। সে যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ করে আমার পায়ের নীচে মেজের উপর পড়ে গেল। আমি তাকে তুলে আরাম কেদারার উপর শুইয়ে দিলুম। পরে তার নাম ধরে চেঁচিয়ে কত ডাকলুম, কিন্তু কোনও সাড়া পেলুম না। তাহার দেহ অসাড়, হিম। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলুম, হতভাগ্যের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে, তার রোগজীর্ণ হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হয়ে গেছে।

"মৃতদেহের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলুম। মনে হল যেন ভীষণ স্বপ্নরাজ্যে আমি বিচরণ করছি। এমন সময় রামনিধি ভেতর দিকের দরজায় এসে ধাক্কা মারলে। আমি তাকে চলে যেতে বল্লুম। কিছুক্ষণ পরে আবার কে একজন এসে বার দিকের দরজায় ধাক্কা দেয়। কিন্তু আমি সাড়া না দেওয়ায় চলে গেল।

"মিত্র সাহেবের ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবার পর হতেই স্থানটার প্রতি আমার কেমন একটা আন্তরিক বিরক্তি জন্মেছিল। জীবনটা এক মস্তবড় ভার বলে মনে হত। সুখের

সব আশা ভরসাই নির্ম্মূল হয়ে গেছে। স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ ফলমূলে শোভিত হবার পূর্ব্বেই স্বহস্তে তা ছেদন করে ফেলেছি। অবশ্য ভায়ের মৃত্যুতে আমি অনেকটা নিরাপদ হলুম বটে, কেলেঙ্কারি ও অপবাদের ভয় আর রইলো না, কিন্তু দুঃখময় অতীতের স্মৃতি কিছুতেই মন হতে মুছে ফেলতে পারলুম না। আব এমন একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগের প্রলোভন কেন ত্যাগ করি? আমাব ভায়ের মৃতদেহ দেখলে আমি যে মারা গেছি, তা সকলেই বিশ্বাস করবে।

"ভাইকে কেউ এখানে আসতে দেখে নি। তার খোঁজ খবরও বড় কেউ রাখে না। তার সঙ্গে পোষাক পরিবর্ত্তন করলে সকলেই মনে করবে ডাক্তার সাহেবই মরে পড়ে রয়েছে। নগদ টাকাও আমার কাছে যথেষ্ট ছিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়ে স্থির করলুন, এস্থান ত্যাগ করে, দূর দেশে গিয়ে নূতন করে জীবনযাত্রা আরম্ভ করবো।

"কাজেও তাই ঘটলো। তার পোষাক পরিচ্ছদ পরে অলক্ষিতে বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেলুম। পরে পঞ্জাবে যাওয়াই স্থির করে ট্রেণে উঠি। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে, আমার মৃত্যু নিয়ে এতটা হৈ চৈ হবে, আর এর জন্যে নিরীহ লোকদের এত কষ্ট ভোগ করতে হবে। জ্বালাময়ী স্মৃতির কঠোর উৎপীড়নের হাত হতে উদ্ধার লাভের আশাতেই, দুঃখকাহিনীপূর্ণ জীবনের এ অধ্যায়টাকে একেবারে বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়ে দেবার ব্যর্থ উদ্দেশ্যেই আমি এই কৌশল অবলম্বন করি। কিন্তু বিদেশে গিয়ে আমার মনের উত্তেজনা অনেকটা শান্ত হয়। বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়ায় মিত্র সাহেবের ভগিনী

কিন্তু আমার উপর আদৌ রাগ করেন নি। তাঁর প্রতি সহানুভূতিতে আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়ে গেল। তখন সকল কথা খুলে তাঁকে একখানি পত্র লিখলুম, কিন্তু বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি, যেন সে চিঠি তিনি কাকেও না দেখান।

"পরশু দিন সংবাদপত্রে আমি এ বিষয় পড়ি। পড়েই প্রথম গাড়ীতেই কলিকাতা চলে আসি।"

ডাক্তার সাহেবের এই বক্তব্যের পর আর সাক্ষীর দরকার হইল না। বিচারও শেষ হইল। পরে ডাক্তারদের পরীক্ষানুযায়ীই স্থির হইল যে, মৃতব্যক্তি বহুদিন যাবৎ হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিল, পরে মানসিক উত্তেজনার আধিক্যবশতঃই তাহার হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। তজ্জন্য কাহাকেও দোষী করা যাইতে পারা যায় না।

ডাক্তার সাহেব পুনর্ব্বার বালিগঞ্জেই বসবাস করিয়া ডাক্তারি ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মিত্র সাহেবও ভুল ধারণার বশীভূত হইয়াই যে তাঁহার উপর বৃথা রাগ ও অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ডাক্তার সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার বন্ধুভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। আশা করি গল্পের শেষ ভাগটুকু আর বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এখনও যিনি বুঝিতে পারেন নাই, একখানি দৈনিক বাঙ্গালা সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটুকু পড়িলেই তাহা তাঁহার সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে,—

"গত ১৪ই আষাঢ় বালিগঞ্জ নিবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় সাহেবের সহিত বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার জে, মিত্রের ভগিনী

ললিতাদেবীর শুভ বিবাহ বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের করুণ প্রেমকাহিনী প্রায় সকলেই অবগত আছেন। অনেক বাধাবিঘ্নান্তে ইঁহাদের এই মধুর মিলন চিরমধুময় ও চিরসুখময় হউক, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

সম্পূর্ণ

নিয়তির গতি (গার্হস্থ্য উপন্যাস)

মূল্যবান এ্যান্টিক কাগজে ছাপা, সুন্দর বিলাতী বাঁধাই,

প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা

"আমরা তাঁহার নিয়তির গতি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। ইহার আখ্যান বস্তুটি যেমন হৃদয়গ্রাহী, ভাষাটিও তেমনই সরল ও প্রাঞ্জল। মূল চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে। তাঁহার লেখার আর একটি গুণ আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, পাঠক-পাঠিকার প্রীতি উৎপাদনের জন্য তিনি কোথাও নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দেন নাই।"—বসুমতী।

"The tragic story is told with considerable pathos, * * * The hero of the main story, Jatindra, is a poignant creation. We confidently hope that the fiction reading public will thank him for the exquisite literary entertainment that the book provides. The plot is well-sustained and the style, as is usual with writer, is chaste, simple and pleasant. The get-up and finish of the book is all that could be desired"— The Bengalee.

"অনেক স্থলে করুণ রসের উদ্দীপনায় অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। ইহা লেখকের শক্তির পরিচায়ক। * * * উপন্যাসখানি আগ্রহোত্তেজক। পাঠ করিতে বসিলে শেষ করিতেই হয়। ভাষা প্রাঞ্জল। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহা পাঠ করিয়া জ্ঞান ও আনন্দলাভ করিতে পারিবেন।"—অর্চ্চনা।

"সাধারণতঃ যেরূপ দেখা যায়, ইহার গল্পাংশ সেরূপ নহে। যুবক-যুবতীর প্রেম ইহার আখ্যানভাগকে দখল করিয়া বসেন নাই। * * * ঘটনা পরম্পরাকে তিনি যে ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য আদ্যোপান্ত সজাগ হইয়া থাকে। * * * তাঁহার ভাষা সরল, শুদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক।"—বাঙ্গালী।

পৈতৃক সম্পত্তি (গার্হস্থ্য উপন্যাস)

মূল্যবান এ্যান্টিক কাগজে ছাপা, সিল্কে বাঁধাই, ২০০ পৃষ্ঠা।

"গ্রন্থে যে কয়টি চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, প্রায় সব গুলিই বেশ স্বাভাবিক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। * * পুস্তকখানির ভাষা আড়ম্বরশূন্য,সরল, প্রাঞ্জল এবং সুসংযত। পাঠকবর্গের নিকট উপন্যাসখানি সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।"—মানসী ও মর্ম্মবাণী।

"It is a Romantic Tale and the character figuring in it are in a tune with the nature of the story. * * * The author, we confidently hope, will be encouraged by his reception from the reading public"—The Bengalee.

"প্লটটি বড় চিত্তাকর্ষক * * * উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।"—নায়ক।

"উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা বড় তৃপ্ত হইয়াছি ; * * * একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে আর শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। * * * চরিত্রগুলি রচনার কৌশলে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ সংযত, বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত।"—বসুমতী।

"প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত। ঘটনা-বৈচিত্র্য পাঠককে মুগ্ধ করিয়া ফেলে এবং গ্রন্থের শেষ অবধি টানিয়া লইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, অনেকগুলি চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে।"—অর্চ্চনা।

"ভাবে ও ভাষায় পুস্তকখানি যে সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চস্থান অধিকার করিবে তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। উপন্যাসের চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হয়, প্লটটি আদ্যন্ত আগ্রহোত্তেজক।"—বাঙ্গালী।